কার্ল মার্কস
ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

[illegible]

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том V

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101-608}{014(01)-80}$ 633-80 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্বোধনী ভাষণ

১৮৬৪, ২৮শে সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের লং-একরস্থ সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিষ্ঠিত (১)

শ্রমজীবী মানুষেরা,

একটি বিরাট সত্য হল এই যে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে শ্রমজীবী জনসমষ্টির দুর্দশার কোনো লাঘব হয় নি, তবু এই সময়টাই শিল্প-বিকাশ ও বাণিজ্যবৃদ্ধির দিক দিয়ে অতুলনীয়। ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ বুর্জোয়ার একটি নরমপন্থী ওয়াকিবহাল মুখপত্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইংলণ্ডের রপ্তানি ও আমদানি যদি শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহলে ইংরেজদের দারিদ্র্য একেবারে শূন্যের স্তরে নেমে যাবে। কিন্তু হায়! ১৮৬৪ সালে ৭ই এপ্রিল ইংলণ্ডের অর্থসচিব* পার্লামেণ্টে তাঁর শ্রোতাদের এই বিবৃতি দিয়ে আনন্দ দান করলেন যে, ইংলণ্ডের মোট আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ১৮৬৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে '৪৪, ৩৯, ৫৫, ০০০ পাউণ্ডে উঠেছে। এই আশ্চর্য সংখ্যাটা ১৮৪৩-এর অপেক্ষাকৃত সম্প্রতিক যুগের বাণিজ্যের প্রায় তিনগুণ!' এই সব বলেও তিনি 'দারিদ্র্য' সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলে ওঠেন, 'সেইসব লোকের কথা ভাবুন, যারা এই এলাকার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবুন সেই মজুরির কথা যা বৃদ্ধি পায় নি', 'সেই মানবজীবন যা প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনের ক্ষেত্রেই শুধু বেঁচে থাকার জন্য একটি সংগ্রাম মাত্র!' তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের লোকদের কথা বলেন নি, সেখানে উত্তরে ধীরে ধীরে মানুষের জায়গা দখল করছে যন্ত্র আর দক্ষিণে মেষ-চারণ যদিও ভাগ্যহত সেই দেশটিতে এমন কি মেষের সংখ্যাও কমে আসছে, অবশ্য মানুষের মতো অত দ্রুত নয়। এর ঠিক আগেই একটা আকস্মিক আতঙ্কের ঝোঁকে

---

* উ. গ্ল্যাডস্টোন। — সম্পাঃ

অভিজাতদের ঊর্ধ্বতন দশ হাজারের উচ্চতমে প্রতিনিধিরা যা ফাঁস করে বসেছিল তার পুনরাবৃত্তি তিনি করেন নি। যখন লন্ডনে টুঁটিচেপারা (২) (garrotters) আতঙ্ক খানিকটা জোরালো হয়ে ওঠে, তখন লর্ড-সভা নির্বাসন দন্ড ও কয়েদ খাটুনি সম্বন্ধে একটা তদন্ত ও রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করে। ১৮৬৩ সালের বিরাট আকারের ব্লু বুকে (৩) এক ভয়াবহ সত্য ফাঁস হয়ে গেল, সরকারী তথ্য ও সংখ্যা দিয়ে প্রমাণিত হল যে দন্ডপ্রাপ্ত সবচেয়ে খারাপ অপরাধীরা, ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের কয়েদী গোলামরাও ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের কৃষি-মজুরদের চেয়ে কম খাটে, বেশি খায়দায়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে (৪) ল্যাঙ্কাশায়ার ও চেশায়ারের শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পথে দাঁড়াল, তখন সেই একই লর্ড-সভা থেকে শিল্পাঞ্চলে একজন চিকিৎসককে পাঠান হল এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তিনি অনুসন্ধান করবেন, গড়পড়তা হিসাবে স্বল্পতম ব্যয়ে ও সহজতম রূপে কত কম পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন ব্যবহার করেই 'অনাহারজনিত রোগ এড়ান যায়।' মেডিকাল ডেপুটি ডাঃ স্মিথ নির্ধারণ করলেন যে, অনাহারজনিত রোগের ঠিক উপরের স্তরে থাকতে হলে... একজন সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সাপ্তাহিক প্রয়োজন হল ২৮,০০০ গ্রেন কার্বন ও ১,৩৩০ গ্রেন নাইট্রোজেন। তিনি এটাও নির্ধারণ করলেন যে, প্রচন্ড দারিদ্র্যের চাপে সুতো কলের কর্মীদের পথ্য কমে গিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছে, এ পরিমাণটা প্রায় তার সমান।* কিন্তু তারপর দেখুন! সেই একই বিজ্ঞ চিকিৎসককে প্রিভি কাউন্সিলের (৫) মেডিকাল অফিসার পরে আর একবার পাঠিয়েছিলেন দরিদ্রতর শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অংশের পুষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে। সেই অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ আছে 'জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ষষ্ঠ রিপোর্টে', যা এই বছরে পার্লামেন্টের আদেশানুসারে প্রকাশিত হয়েছে। কী আবিষ্কার

---

* পাঠককে একথা মনে করিয়ে দেওয়া যাচ্ছে যে, জল এবং কিছু অজৈব উপাদান ছাড়া, মানুষের খাদ্যের কাঁচামাল হল কার্বন ও নাইট্রোজেন। অবশ্য, মানব-দেহকে পরিপুষ্ট করতে হলে এই সহজ রাসায়নিক উপাদানগুলিকে শাকশব্জি ও প্রাণীজাত খাদ্যবস্তু রূপেই সরবরাহ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আলুতে প্রধানত থাকে শুধু কার্বন, আর গমের রুটিতে যথাযথ অনুপাতে থাকে কার্বনজাত ও নাইট্রোজেনজাত বস্তু। [মার্কসের টীকা।]

করলেন ডাক্তার? যারা রেশম বোনে, যেসব মেয়েরা সুচের কাজ করে, যারা চামড়ার দস্তানা বানায়, মোজা তৈরি করে ইত্যাদি, তারা গড়পড়তা যা পায় তা সুতাকল কর্মীদের দুর্দশাকালীন খোরাকের চেয়েও খারাপ, 'অনাহারজনিত রোগ এড়ানর জন্য ঠিক যতটুকু' কার্বন ও নাইট্রোজেনও 'দরকার' সেটুকুও নয়।

এই রিপোর্ট থেকেই উদ্ধৃত করছি: 'তাছাড়া, কৃষক-জনসাধারণের মধ্য থেকে যে-সমস্ত পরিবারকে পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এটাই দেখা গেল যে, তাদের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশীর ক্ষেত্রে কার্বনঘটিত খাদ্য জুটছে প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম; নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম জুটছে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী ক্ষেত্রে এবং তিনটি জেলাতে (বার্কশায়ার, অক্সফোর্ডশায়ার এবং সামারসেটশায়ার। লোকের গড়পড়তা দৈনন্দিন আহার্যেই নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য প্রয়োজনের চেয়ে কম।' সরকারী রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'এ কথা মনে রাখা উচিত যে, নিতান্ত নিরুপায় হলেই তবে লোকেরা খাদ্যের অনটন স্বীকার করে এবং তাই সাধারণত অন্যান্য ব্যাপারে চরম কৃচ্ছ্রতার পরই তবে খাদ্যের কৃচ্ছ্রতা আসে... এমন কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটাও এদের কাছে ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য, এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আত্মসম্মানী প্রচেষ্টা এখনও চোখে পড়লেও প্রতি ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা মানে অধিকতর ক্ষুধার জ্বালা।' 'এ ভাবনা বেদনাদায়ক, বিশেষ করে যদি এ কথা মনে রাখি যে উপরোক্ত দারিদ্র্য অলসতার সঙ্গত দারিদ্র্য নয়, সে দারিদ্র্য সবক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষেরই দারিদ্র্য। বস্তুতপক্ষে যে কাজ করে এই সামান্য ভিক্ষান্ন মিলছে, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যধিক দীর্ঘ।'

রিপোর্টে এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত সত্যও উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, ইংলণ্ড, ওয়েলস্, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড — 'ইউনাইটেড কিংডমের এই বিভাগগুলির মধ্যে' যে বিভাগ সবচেয়ে অবস্থাপন্ন সেই 'ইংলণ্ডের কৃষিজীবী জনসাধারণই সবচেয়ে কম খাদ্য খেয়ে থাকছে'; কিন্তু, এমন কি বার্কশায়ার, অক্সফোর্ডশায়ার ও সামারসেটশায়ারের কৃষি-মজুরেরাও পূর্ব-লণ্ডনের দক্ষ কারখানার-কারিগরদের অনেকের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকে।

এই হচ্ছে সরকারী বিবৃতি, যা ১৮৬৪ সালে পার্লামেণ্টের আদেশেই প্রকাশিত হয়েছে অবাধ-বাণিজ্যের স্বর্ণ যুগে, যখন অর্থসচিব কমন্স-সভার কাছে এই কথা জানান যে,

'গড় হিসাবে ব্রিটিশ শ্রমিকের অবস্থার যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তা যে কোনো দেশের বা যে কোনো যুগের ইতিহাসে অসাধারণ ও অতুলনীয় বলে আমাদের বিশ্বাস।'

এই সরকারী অভিনন্দনের তাল কাটছে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী রিপোর্টের এই শুষ্ক মন্তব্যে:

'কোনো দেশের জনস্বাস্থ্য বলতে বোঝায় জনগণের স্বাস্থ্য, এবং জনগণও ততক্ষণ স্বাস্থ্যবান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একেবারে তলার দিকে তারা অন্তত কিছুটা সমৃদ্ধ হয়।'

জাতির প্রগতিসূচক পরিসংখ্যানগুলির নৃত্যে অর্থসচিবের চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে, তিনি উদ্দাম আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন,

'১৮৪২ থেকে ১৮৫২-এর মধ্যে দেশের ট্যাক্স-যোগ্য আয় শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল... আর ১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ — গত ৮ বৎসরে এই আয় ১৮৫৩-এর তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে! ব্যাপারটি এত আশ্চর্য যে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়...' মিঃ গ্ল্যাডস্টোন যোগ করেন, 'সম্পদ ও শক্তির এই চাঞ্চল্যকর বৃদ্ধি পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ!'

আপনারা যদি জানতে চান, স্বাস্থ্যহানি নৈতিক অধঃপাত ও মানসিক ধ্বংসের কোন অবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি 'পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শক্তির এই চাঞ্চল্যকর বৃদ্ধি' ঘটিয়েছে এবং এখনও ঘটাচ্ছে, তাহলে ছাপাখানা ও দরজিদের কর্মশালার উপর বিগত 'জনস্বাস্থ্য রিপোর্টে' প্রদত্ত ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ১৮৬৩ সালের 'শিশু নিয়োগ কমিশনের রিপোর্ট'এর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। সেখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে:

'শ্রেণী হিসাবে কুম্ভকাররা সকলেই, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই হল এক অতি অধঃপতিত জনসংখ্যা'; বলা হয়েছে যে, 'স্বাস্থ্যহীন শিশুরাই আবার স্বাস্থ্যহীন পিতা-মাতা হয়ে দাঁড়ায়'; 'ক্রমান্বয়ে জাতির অবনতি এগিয়েই চলবে'; আবার, 'পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনবরত লোক সংগ্রহ করা যদি না হত এবং যদি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান বংশে বিবাহাদি না চলত, তাহলে স্টাফোর্ডশায়ারের জনসংখ্যার অবনতি হত আরও অনেক বেশী।'

'ঠিকা রুটি-কারিগরদের অভাব-অভিযোগ' নিয়ে মিঃ ট্রেমেনহিরের ব্লু বুকের দিকে নজর দিন! তাছাড়া, কারখানাসমূহের ইন্সপেক্টররা যে আপাত-

বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিল এবং যা রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে, সে বিবৃতি পড়ে কে না শিউরে উঠেছে? সে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, তুলার দুর্ভিক্ষে সাময়িকভাবে সুতাকল থেকে ছাড়া পাওয়ার ফলে বরাদ্দ দুঃস্থ খাদ্য মাত্রায় ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নতিই হচ্ছিল, আর তাদের শিশুসন্তানদের মৃত্যুহার কমছিল কারণ শিশুদের মায়েরা এতদিনে গডফ্রের আরকের [Godfrey's cordial] বদলে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াবার অবকাশ পাচ্ছিল।

আরেকবার উল্টো দিকটা দেখুন! ১৮৬৪-র ২০শে জুলাই কমন্স-সভার সামনে যে আয় ও সম্পত্তিগত ট্যাক্সের বিবরণ দাখিল করা হয় তা থেকে আমরা এই কথাই জানতে পারি যে, তহসিলদারদের হিসাব অনুযায়ী যেসব লোকের বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ পাউন্ড ও তদূর্ধ্ব, তাদের দলে ১৮৬২-র ৫ই এপ্রিল থেকে ১৮৬৩-র ৫ই এপ্রিলের মধ্যে আরও তেরজন যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ এই এক বছরে তাদের সংখ্যা ৬৭ থেকে ৮০-তে পৌঁছেছে। সেই একই বিবরণ থেকে এ কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, প্রায় ২,৫০,০০,০০০ পাউন্ড পরিমাণ বাৎসরিক আয় ভাগাভাগি হয়ে যায় ৩,০০০ লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইংলন্ড ও ওয়েলস্-এর সমগ্র কৃষি-মজুরেরা আয় হিসাবে যে মুষ্টি ভিক্ষা লাভ করে তার মোট পরিমাণ থেকেও এ আয় কিছুটা বেশী। ১৮৬১ সালের লোকগণনার হিসাবটি খুলে দেখলে জানতে পারবেন যে, ইংলন্ড ও ওয়েলস্-এর ভূমিসম্পত্তির পুরুষ মালিকের সংখ্যা ১৮৫১-তে যেখানে ছিল ১৬,৯৩৪, সেখানে তা ১৮৬১-তে কমে দাঁড়িয়েছে ১৫,০৬৬। অর্থাৎ, ১০ বছরে ভূমিসম্পত্তির কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১ ভাগ। এই হারে যদি অল্প কয়েকজনের হাতে দেশের জমির কেন্দ্রীভবন এগিয়ে যায়, তাহলে ভূমি সমস্যাটি অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যে, যখন অর্ধেক আফ্রিকা প্রদেশটির মালিক হয়েছে ছয়জন ভদ্রলোক এ কথা শুনে হেসেছিলেন নেরো।

'এত আশ্চর্য যে প্রায় অবিশ্বাস্য এইসব তথ্য নিয়ে' আমরা যে এত বেশী আলোচনা করলাম তার কারণ এই যে, শিল্প বাণিজ্যে ইউরোপের শীর্ষে রয়েছে ইংলন্ড। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, কয়েকমাস পূর্বে লুই-ফিলিপের এক উদ্বাস্তু পুত্র প্রকাশ্যে ইংরেজ কৃষি-মজুরদের এই বলে

অভিনন্দিত করেন যে চ্যানেলের অপর পারে এদের অল্পতর সঙ্গতিসম্পন্ন সাথীদের তুলনায় এদের ভাগ্য ভাল। বাস্তবিকই, স্থানীয় রং বদলে ও কিছুটা সংকুচিত আকারে ইংলন্ডের তথ্যগুলি ইউরোপের সমস্ত শিল্পোন্নত ও প্রগতিশীল দেশেই পুনরুদিত। এই সমস্ত দেশেই ১৮৪৮ সাল থেকে এক অশ্রুতপূর্ব শিল্প বিকাশ ও আমদানি রপ্তানির অকল্পনীয় প্রসার ঘটেছে। এই সমস্ত দেশেই 'পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শক্তির বৃদ্ধি' সত্যই 'চাঞ্চল্যকর'। ইংলন্ডের মতো এইসব দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর অল্প এক অংশের আসল মজুরির কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আর্থিক মজুরির সামান্য বৃদ্ধি সুখসুবিধার যেটুকু আসল লাভ বোঝায় তা দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির খরচ ১৮৫২ সালে ৭ পাউন্ড ৭ শিলিং ৪ পেন্সের জায়গায় ১৮৬১-তে ৯ পাউন্ড ১৫ শিলিং ৮ পেন্সে উঠে যাওয়াতে শহরের দুঃস্থ আবাস বা অনাথালয়ের বাসিন্দাদের যেটুকু উপকার সম্ভব তার বেশী কিছু নয়। প্রত্যেক জায়গাতেই শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশ নিচে নেমে যাচ্ছে, অন্তত সেই হারেই যে হারে তাদের উপরতলার লোকেদের সামাজিক জীবনে উন্নতি হচ্ছে। যন্ত্রের উন্নতি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নতুন উপনিবেশ সৃষ্টি, দেশান্তর গমন, নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা, অবাধ-বাণিজ্য — এসব কোনো কিছুই, এমন কি সবকটি একত্র করেও মেহনতী জনগণের দুর্দশা যে দূর হবে না, বরং বর্তমানের মিথ্যা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শ্রমের উৎপাদন-শক্তির প্রতিটি নতুন বিকাশের প্রবণতাই যে সামাজিক বৈষম্য গভীরতর করার ও সামাজিক বৈরভাব তীক্ষ্ণতর করার দিকেই — এই সত্য আজ ইউরোপের সকল দেশের প্রত্যেকটি সংস্কারমুক্ত লোকের কাছেই প্রমাণিত হয়ে উঠেছে, এই সত্যকে অস্বীকার করে শুধু তারাই যারা অপরকে মূর্খের স্বর্গে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আর্থিক প্রগতির এই 'চাঞ্চল্যকর' যুগে অনাহারজনিত মৃত্যু প্রায় একটা প্রথার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুগ শিল্প ও বাণিজ্যের সংকটরূপ সামাজিক মহামারীর আরো ঘন ঘন পুনরাগমন, অধিকতর বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান মারাত্মক ফলাফলের দ্বারা চিহ্নিত।

১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলো ব্যর্থ হবার পর, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে শ্রমিক

শ্রেণীর যত পার্টি সংগঠন ও পার্টি পত্রিকা ছিল সবকিছুই শক্তির লৌহ হস্তে নিষ্পেষিত করা হল, শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী সন্তানরা হতাশ হয়ে আশ্রয় নিলেন আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারের প্রজাতন্ত্রে, আর শিল্পোন্মাদনা, নৈতিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এক যুগের সামনে মিলিয়ে গেল মুক্তির স্বল্পস্থায়ী স্বপ্ন। ইউরোপখণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর পরাজয়ের জন্য অংশত দায়ী ছিল ইংরেজ সরকারের কূটনীতি; এখনকার মতোই তখনও ইংরেজ সরকার সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মন্ত্রিসভার সঙ্গে (৬) ভ্রাতৃত্বসুলভ সৌহার্দ্য রেখে কাজ করছিল। এই পরাজয়ের সংক্রামক ফলাফল শীঘ্রই চ্যানেলের এপারেও এসে পৌঁছল। ইউরোপখণ্ডের ভাইদের বিপর্যয়ে একদিকে যেমন ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল কমে গেল ও নিজ আদর্শের সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ভেঙে পড়ল, তেমনি অপরদিকে এর ফলে ভূমিপতি ও ধনপতিদের কিছুটা বিচলিত আত্মপ্রত্যয় আবার ফিরে এল। যে সব সুবিধা দেবার কথা তারা আগেই বিজ্ঞাপিত করেছিল, ঔদ্ধত্যভরে সে সব তারা প্রত্যাহার করে নিল। নতুন নতুন স্বর্ণ-অঞ্চল আবিষ্কৃত হওয়ায় দলে দলে লোক দেশত্যাগ করতে লাগল এবং তার ফলে ব্রিটিশ প্রলেতারীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় ফাঁক। তাদের আগেকার দিনের সক্রিয় অন্য কর্মীরা বেশী কাজ ও বেশী মজুরির সাময়িক ঘুষের মায়ায় 'রাজনৈতিক দালালে' পরিণত হল। চার্টিস্ট আন্দোলনকে (৭) জীবিত রাখার বা পুনর্গঠিত করার সমস্ত প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হল, শ্রমিক শ্রেণীর মুখপাত্র কাগজগুলি জনসাধারণের উদাসীনতায় একে একে বিলুপ্ত হয়ে গেল; এবং সত্য কথা বলতে গেলে এমন এক রাজনৈতিক অবলুপ্তির অবস্থার সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী পরিপূর্ণ মাত্রায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বলে মনে হল যা পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। সুতরাং, ব্রিটেন ও ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের সাযুজ্য না থাকলেও অন্তত পরাজয়ের সাযুজ্য ঘটল।

তা সত্ত্বেও, ১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলির পরবর্তী যুগটা ক্ষতিপূরণের চিহ্ন বর্জিত নয়। এখানে আমরা শুধু দুটি বিরাট ঘটনার উল্লেখ করব।

ত্রিশ বৎসর ধরে প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করার পর ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী ভূমিপতি ও ধনপতিদের মধ্যে এক সাময়িক ভাঙন কাজে লাগিয়ে

দশ ঘণ্টার আইনটি (৮) পাশ করাতে সক্ষম হল। এর ফলে কারখানার শ্রমিকদের প্রভূত শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক যে উপকারের কথা কারখানা পরিদর্শকদের অর্ধ বাৎসরিক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয় তা এখন সর্বত্রই স্বীকৃত। ইউরোপে অধিকাংশ সরকারকেই ইংলন্ডের ফ্যাক্টরি আইন কম বেশী সংশোধিত রূপে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং ইংলন্ডের পার্লামেণ্টকেও প্রতিবৎসর এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারিক সুবিধাটুকু ছাড়াও, শ্রমজীবী মানুষের এই বিধানটির বিস্ময়কর সাফল্যকে গৌরবজনক মনে করার অন্য কারণও ছিল। ডাঃ উর, অধ্যাপক সিনিয়র ও এই জাতের অন্যান্য মহাপণ্ডিতদের মতো তাদের বিজ্ঞানের অতি কুখ্যাত মুখপাত্রদের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং প্রাণভরে প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমের ঘণ্টা যদি আইনগত ভাবে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তাতে ব্রিটিশ শিল্পের মৃত্যু পরোয়ানাই জারী করা হবে; এ শিল্প বাঁচতে পারে কেবল পিশাচের মতো রক্ত চুষে, তদুপরি শিশুর রক্ত চুষেই। পুরাকালে শিশুহত্যা ছিল মোলখ [Moloch] পূজার্চনার এক রহস্যময় অনুষ্ঠান কিন্তু সে অনুষ্ঠান পালন করা হত শুধু অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ উপলক্ষে, বৎসরে হয়ত বা একবার, এবং তা ছাড়া, শুধুমাত্র গরিব শিশুদের ওপরেই একমাত্র পক্ষপাত মোলখের ছিল না। শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা আইনত সীমাবদ্ধ রাখার এই সংগ্রাম আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এই কারণে যে আতঙ্কিত লোলুপদের কথা ছাড়াও এর প্রভাব পড়েছিল এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর, একদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রের যা ভিত্তি, সেই চাহিদা ও যোগানের নিয়মের অন্ধ প্রভুত্বের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর যা অর্থশাস্ত্র সেই সামাজিক দূরদৃষ্টি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্ব। সুতরাং, দশ ঘণ্টার আইনটি শুধু যে এক বৃহৎ ব্যবহারিক সাফল্য তাই নয়; এ হল একটা নীতিরও জয়; এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রের কাছে বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থশাস্ত্র পরাজিত হল।

কিন্তু সম্পত্তির অর্থশাস্ত্রের উপর শ্রমের অর্থশাস্ত্রের আরো বড় একটি বিজয় বাকি ছিল। আমরা সমবায় আন্দোলনের কথা বলছি, বিশেষত কোনোরকম সহায়তা না পেয়েও কিছু সাহসী 'মজুরের' ['hands'] চেষ্টায় যে সব সমবায়মূলক কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার কথা। এই ধরনের বিরাট

সামাজিক পরীক্ষার মূল্য অসীম বিপুল। যুক্তি তর্কের বদলে কাজ দিয়েই এই সমবায়গুলি দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর নিয়োগকারী মালিক শ্রেণী না থাকলেও বৃহৎ আকারে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের নির্দেশানুযায়ী উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া যায়; দেখিয়ে দিয়েছে যে, সার্থক হতে হলে শ্রমজীবীর ওপর আধিপত্য ও তাকে লুণ্ঠিত করার মাধ্যমরূপে শ্রমের উপায়কে একচেটিয়াধীন করার প্রয়োজন পড়ে না; দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঠিকা শ্রম হচ্ছে দাসশ্রম ও ভূমি দাসশ্রমের মতোই শ্রমের এক নিকৃষ্ট ও স্বল্পস্থায়ী রূপমাত্র, উৎসুক হাতে প্রস্তুত মনে প্রফুল্ল চিত্তে চালানো সংঘবদ্ধ শ্রমের সামনে যা অদৃশ্য হতে বাধ্য। ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন সমবায় পদ্ধতির বীজ বপন করেন; ইউরোপখণ্ডে শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে যে সব পরীক্ষা করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা উদ্ভাবিত নয়, ১৮৪৮ সালে সরবে ঘোষিত তত্ত্বাদির ব্যবহারিক পরিণতি।

সেইসঙ্গে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত সময়কালের অভিজ্ঞতা থেকে এটাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, নীতির দিক থেকে যতই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহারের দিক থেকে যতই উপযোগী হোক না কেন, সমবায় শ্রমকে ব্যক্তিগত শ্রমিকদের অনিয়মিত প্রচেষ্টার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখলে, একচেটিয়া মালিকানার জ্যামিতিক হারের ক্রমবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়া বা জনসাধারণকে মুক্ত করা অথবা তাদের দুর্দশার বোঝাটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাঘব করাও কখনও সম্ভব হবে না। বোধহয় ঠিক এই কারণেই, মধুভাষী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, বুর্জোয়া শ্রেণীর মানব হিতৈষী বাক্যবাগীশরা এবং এমন কি উৎসাহী অর্থতাত্ত্বিকেরা পর্যন্ত সকলেই হঠাৎ এই সমবায় শ্রম পদ্ধতির ধিনাধিনে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন, যদিও ঠিক এই পদ্ধতিকেই তাঁরা স্বপ্নচারীর ইউটোপিয়া বলে উপহাস অথবা সমাজবাদীর অনাচার বলে নিন্দিত করে অংকুরেই বিনষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। মেহনতী জনসাধারণকে উদ্ধার করতে হলে সমবায় শ্রমকে দেশজোড়া আয়তনে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং কাজেই তাকে সারা জাতির সম্পদ দিয়ে পরিপোষণ করতে হবে। কিন্তু ভূমিপতি ও পুঁজিপতিরা তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া রক্ষা ও চিরস্থায়ী করার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা সর্বদাই ব্যবহার করবে। সুতরাং, শ্রমের মুক্তির পথে সাহায্য করা দূরে থাক, সে পথে সর্বপ্রকার বাধা সৃষ্টির

কাজই তারা করে যাবে। মনে করে দেখুন, গত অধিবেশনে লর্ড পামারস্টোন আইরিশ প্রজাস্বত্ব বিলের প্রবক্তাদের অপদস্থ করার জন্য কী রকম বিদ্রূপ করেছিলেন। তিনি বলে দিলেন, 'কমন্স-সভা হচ্ছে ভূস্বামীদের সভা।'

অতএব রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এক মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা তারা উপলব্ধি করেছে বলেই মনে হয়, কেননা ইংলন্ড, জার্মানি, ইতালি এবং ফ্রান্সে একই সঙ্গে নবজাগরণ শুরু হয়েছে এবং সর্বত্র একসঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির রাজনৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টাও চলছে।

সাফল্যের একটা উপাদান শ্রমিক শ্রেণীর আছে -- সংখ্যা; কিন্তু সঙ্ঘের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হতে পারলে তবেই সংখ্যার পাল্লা ভারী হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে থাকা উচিত ও তাদের মুক্তি সংগ্রামে পরস্পরের জন্য একযোগে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করা উচিত সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি অবহেলা তাদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলিকে কী রকম সাধারণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে ফেলে। এই চিন্তাই ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরে সেণ্ট মার্টিন হলে এক সভায় সমবেত বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষকে তাদের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আর একটি প্রত্যয়ও এই সভাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যদি তাদের ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার জন্য অনুসৃত যে পররাষ্ট্র নীতি জাতিগত কুসংস্কার ব্যবহার করছে, দস্যু-যুদ্ধে জনগণের রক্ত ও সম্পদ অপচয় করছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এ মহান ব্রতটি কী করে পূর্ণ করা যাবে? আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে দাসত্বকে কায়েম রাখার ও প্রচারিত করার কলঙ্কময় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে পশ্চিম ইউরোপকে বাঁচিয়েছিল শাসক শ্রেণীর বিজ্ঞ মনোভাব নয়, বাঁচিয়েছিল সেই অপরাধসূচক মূর্খামির বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীরই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ। ককেশাসের পার্বত্য দুর্গটি যখন রাশিয়ার শিকারে পরিণত হচ্ছিল এবং বীর পোল্যান্ডকে রাশিয়া যখন হত্যা করছিল তখন ইউরোপের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে নির্লজ্জ সমর্থন, ভন্ড সহানুভূতি বা আহাম্মকসুলভ

উদাসীনতাই দেখিয়েছিল, যে বর্বর শক্তির মাথা রয়েছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এবং যার হাত রয়েছে ইউরোপের প্রত্যেকটি মন্ত্রিসভায়, সেই রাশিয়ার যে ব্যাপক ও অপ্রতিহত অনধিকার হস্তক্ষেপ ঘটছে; তা থেকে শ্রমিক শ্রেণী শিখেছে যে, তার কর্তব্য হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির রহস্য আয়ত্ত করা; নিজ নিজ সরকারের কূটনৈতিক কার্যকলাপের উপর নজর রাখা; প্রয়োজন হলে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে সে কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা, তাকে ব্যর্থ করতে অক্ষম হলে অন্তত সকলে একসঙ্গে তার প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং নীতি ও ন্যায়ের যে সব সহজ নিয়ম দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক শাসিত হওয়া উচিত, তাদেরই প্রতিষ্ঠা করা জাতিসমূহের মধ্যেকার যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম হিসাবে।

এই রকমের পররাষ্ট্র নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের একাংশ।

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

১৮৬৪ সালের অক্টোবর ২১-২৭ তারিখে মার্কস কর্তৃক লিখিত

'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির **অভিভাষণ এবং খসড়া নিয়মাবলি, লঙ্গ একর, লণ্ডন, সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত**', পুস্তিকায় প্রকাশিত লণ্ডনে, ১৮৬৪ সালের নভেম্বরে মুদ্রিত। জার্মান ভাষায় লেখকের অনুবাদ ২ ও ৩ নং 'Social-Demokrat' পত্রিকায়, ১৮৬৪ সালের ২১শে ও ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত

ইংরেজি পুস্তিকার পাঠ অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলি (১)

যেহেতু

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম;

শ্রম করে যে মানুষ, শ্রম-উপায়ের অর্থাৎ জীবনধারণের বিভিন্ন উৎসের একচেটিয়া মালিকের কাছে সেই মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতাই রয়েছে সকল রকম দাসত্বের, সব ধরনের সামাজিক দুর্গতি, মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলে;

সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, যা সাধনের উপায় হিসেবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তার অধীনস্থ হতে হবে;

সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মধ্যকার বহুবিধ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়;

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর;

ইউরোপের সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুজ্জীবন যেমন এক নতুন আশার সঞ্চার করছে, তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ

সাবধান বাণীও জানিয়ে দিচ্ছে যেন পুরানো ভুল আর না করা হয়, এবং আহ্বান জানাচ্ছে আজ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির আশু একত্রীকরণের;

এই সব কারণের জন্য শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।

এই সংস্থা ঘোষণা করছে যে:

যে সমস্ত সঙ্ঘ ও ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাঁরা বর্ণ, ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয়তা নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি তাঁদের আচরণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতা;

এই সমিতি মানে যে **কর্তব্য ব্যতিরেকে অধিকার এবং অধিকার ব্যতিরেকে কর্তব্য নেই।**

এই মনোভাব নিয়েই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী রচনা করা হল:

১। শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষা, অগ্রগতি ও পূর্ণমুক্তি — এই এক লক্ষ্য নিয়ে গঠিত বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘ আছে, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার একটি কেন্দ্রীয় মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।

২। এই সমিতির নাম হবে 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'।

৩। সমিতির শাখাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতি বৎসর শ্রমজীবী মানুষের একটি সাধারণ কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করবে, আন্তর্জাতিক সমিতির কাজকে সফলভাবে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংস্থার সাধারণ পরিষদ নিয়োগ করবে।

৪। প্রত্যেক কংগ্রেস পরবর্তী কংগ্রেসের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে প্রতিনিধিরা সমবেত হবেন এবং এর জন্য তাদের কোনো বিশেষ আমন্ত্রণ জানান হবে না। প্রয়োজন হলে, সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু অধিবেশনের সময় স্থগিত রাখার ক্ষমতা এই পরিষদের নেই। প্রতি বৎসর কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের কর্মকেন্দ্র স্থির করে দেবে, এর সভ্যদের নির্বাচিত করবে। এইভাবে নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা থাকবে নিজেদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার।

সাধারণ কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় সাধারণ পরিষদের বৎসরের

কাজকর্মের একটি প্রকাশ্য হিসাব উপস্থিত করা হবে। জরুরী অবস্থায় সাধারণ পরিষদ নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশনের আগেও সাধারণ কংগ্রেস আহ্বান করতে পারবে।

৫। আন্তর্জাতিক সমিতিতে যে সব দেশের প্রতিনিধিত্ব আছে তাদেরই শ্রমিক সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। কাজকর্ম চালাবার জন্য সাধারণ পরিষদ তার সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নির্বাচিত করবে; যেমন, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন দেশের জন্য এক একজন করেস্পণ্ডিং সম্পাদক ইত্যাদি।

৬। যাতে একদেশের শ্রমজীবী মানুষ অন্য প্রত্যেকটি দেশের স্বশ্রেণীর আন্দোলনের খবরাখবর সদা সর্বদাই পেতে পারে; যাতে একই সঙ্গে একই সাধারণ পরিচালনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চলতে পারে; একটি সংঘের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি যাতে সমস্ত সংঘ দ্বারাই আলোচিত হতে পারে; এবং যখন কোনো আশু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় — উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে তখন যাতে সংযুক্ত সংঘগুলির কার্যক্রম একযোগে একইরকম হতে পারে, তার জন্য সমিতির বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় শাখাগুলির পক্ষে সাধারণ পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সংঘগুলির সামনে প্রস্তাব উপস্থিত করার উদ্যোগ সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য সাধারণ পরিষদ কিছুকাল পর পর বিবরণী প্রকাশ করবে।

৭। যেহেতু ঐক্য ও সংহতির শক্তি ছাড়া কোনো দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে সফলতা আনা সম্ভব নয়, এবং যেহেতু অন্যদিকে, শ্রমজীবী মানুষের সংঘের অল্প কয়েকটি জাতীয় কেন্দ্রকে নিয়ে, নাকি অনেকগুলি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সংঘ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তার উপরই আন্তর্জাতিক সাধারণ পরিষদের উপযোগিতা নির্ভর করছে, সেইজন্য আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্যদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবী মানুষের বিচ্ছিন্ন সংঘগুলিকে যুক্ত করে এক একটি জাতীয় সংগঠনে পরিণত করতে পারা যায়, যার প্রতিনিধিত্ব করবে এক একটি

কেন্দ্রীয় জাতীয় সংস্থা। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নিয়মের এই ধারার প্রয়োগ নির্ভর করবে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিশেষ আইনের উপর, এবং আইনগত প্রতিবন্ধকতার কথা বাদ দিলে কোনো স্বাধীন স্থানীয় সঙ্ঘের পক্ষে সরাসরি সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপ করারও কোনো বাধা থাকবে না।

৮। সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপের জন্য সমিতির প্রত্যেক শাখার নিজ নিজ করেস্পন্ডিং সম্পাদক নিয়োগ করার অধিকার থাকবে।

৯। যারাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নীতিসমূহ স্বীকার ও সমর্থন করে তাদের প্রত্যেকেই এর সদস্য হবার যোগ্য। প্রত্যেক শাখা সেই শাখা কর্তৃক গৃহীত সদস্যদের সততার জন্য দায়ী থাকবে।

১০। আন্তর্জাতিক সমিতির কোনো সদস্য একদেশ থেকে আর একদেশে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করলে, তিনি সংস্থাভুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের ভ্রাতৃত্বসুলভ সাহায্য পাবেন।

১১। শ্রমজীবী মানুষের যে সঙ্ঘগুলি আন্তর্জাতিক সমিতিতে যোগ দিচ্ছে সেগুলি ভ্রাতৃসূচক সহযোগিতার চিরস্থায়ী বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হলেও, তাদের বর্তমান সংগঠনকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

১২। প্রত্যেক কংগ্রেসে এই নিয়মাবলী সংশোধন করা যেতে পারে, তবে সেরূপ সংশোধনের পক্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তিনভাগের দুভাগের সমর্থন থাকা চাই।

১৩। বর্তমান নিয়মাবলীতে সন্নিবিষ্ট হয় নি এরূপ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য বিশেষ বিধান করা যাবে, সেগুলি হবে প্রত্যেক কংগ্রেসের সংশোধন সাপেক্ষ।

২৫৬, High Holborn, W. C.
London, ১৮৭১ সালের ২৪ অক্টোবর

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ইংরেজি ও ফরাসিতে ১৮৭১ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর, জার্মান ভাষায় ১৮৭২ সালে ফেব্রুয়ারিতে।

ইংরেজি ভাষায় লিখিত ১৮৭১-এর পুস্তিকা অনুসারে অনূদিত।

কার্ল মার্কস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন সমীপে (১০)

মান্যবর!

বিপুল সংখ্যাধিক্যে আপনার পুনর্নির্বাচনে আমরা আমেরিকার জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনার প্রথম নির্বাচনের নরমপন্থী ধ্বনিতে যেক্ষেত্রে দাসমালিকদের প্রভুত্বের প্রতিরোধ করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আপনার দ্বিতীয় নির্বাচনের বিজয়ী জঙ্গী জিগির ঘোষণা করছে: নিপাত যাক দাসপ্রথা!

আমেরিকায় এই মহাসংঘর্ষের গোড়া থেকেই ইউরোপের শ্রমিকেরা স্বতঃবোধে অনুভব করছিল যে তাদের ভাগ্য তারকালাঞ্ছিত পতাকার সঙ্গে জড়িত। ভূখণ্ডের জন্য যে সংগ্রাম থেকে এই নিষ্করুণ মহাকাব্যের শুরু তা কি এই মীমাংসা করবে না — দুর্নিরীক্ষ্য বিস্তারের অনাহত মৃত্তিকা কি তুলে দেওয়া হবে অভিবাসীদের শ্রমের নিকট নাকি তা কলঙ্কিত হবে দাসেদের তত্ত্বাবধায়কদের চলন ভঙ্গিতে?

৩ লক্ষ দাসমালিকের গোষ্ঠীতন্ত্র যখন বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের পতাকায় 'দাসত্ব' কথাটা লেখার স্পর্ধা করল, যেখানে প্রায় শত বর্ষ পূর্বে দেখা দিয়েছিল একটি একক, মহান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা, যেখানে ঘোষিত হয়েছিল প্রথম মানবাধিকারের বিবৃতি (১১) এবং আঠারো শতকের ইউরোপীয় বিপ্লবগুলির জন্য সঞ্চার করেছিল প্রথম প্রেরণা, যখন ঠিক সেই সব জায়গাগুলিতেই প্রতিবিপ্লব অবিচল সঙ্গতিপরায়ণতার সঙ্গে এই বলে বড়াই করছে যে 'আগেকার সংবিধান গড়ার সময়কার ধ্যানধারণা' তা দূরীভূত করেছে, ঘোষণা করছে যে 'দাসপ্রথাই একটা উপকারী প্রতিষ্ঠান, শ্রমের সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ক বিষয়ক বিপুল সমস্যাটার মূলত একমাত্র সমাধান' এবং বেহায়ার মতো দাবি করেছে যে মানুষের ওপর মালিকানা 'নবসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর' — ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী তখন তৎক্ষণাৎ বুঝেছিল — উচ্চ শ্রেণীগুলির পক্ষ থেকে জেন্ট্রি-কনফেডারেটদের উদ্দাম পোষকতা যে অশুভ হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, তারও আগে — বুঝেছিল যে

দাসমালিকদের বিদ্রোহে বাজছে শ্রমের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমালিকানার সাধারণ জেহাদের ডঙ্কা, আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপারে এই বিশাল যুদ্ধে মেহনতীদের ভাগ্য, তাদের ভবিষ্যৎ আশা, এমনকি তাদের অতীত অর্জনও বাজি ধরা হয়েছে। তাই তুলা সংকট (১২) যে দুর্দশায় নিপতিত করেছে, শ্রমিক শ্রেণী সর্বত্র তা সহ্য করেছে ধৈর্য ধরে, দাস মালিকানার অনুকূলে যে হস্তক্ষেপের জন্য তাদের উত্তমদের যে পীড়াপীড়ি চলছিল তার তীব্র বিরোধিতা করেছে, — এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে তারা ন্যায্য কর্মের জন্য রক্তের চাঁদা দিয়েছে।

উত্তরের যারা সত্যকার রাজনৈতিক শক্তি সেই শ্রমিকেরা যতক্ষণ তাদের নিজ প্রজাতন্ত্রকে অপবিত্র করতে দিয়েছে দাসপ্রথায়, যে নিগ্রোদের সম্মতির অপেক্ষা না করে কেনা-বেচা হত, তাদের সামনে তারা যতক্ষণ শ্বেত শ্রমিকের এই মহা সুবিধায় গরব করছিল যে তারা নিজেই নিজেদের বেচতে পারে, বেছে নিতে পারে নিজের মালিককে — এতক্ষণ তারা শ্রমের সত্যকার স্বাধীনতা অর্জনের অবস্থায় ছিল না, মুক্তির জন্য সংগ্রামে তাদের ইউরোপীয় ভ্রাতাদের সমর্থন করার মতো অবস্থাতেও ছিল না; কিন্তু প্রগতির পথে এই বাধা এখন দূর হয়েছে গৃহযুদ্ধের রক্ত তরঙ্গে।

ইউরোপের শ্রমিকদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে স্বাধীনতার জন্য আমেরিকান যুদ্ধ (১৩) যেমন বুর্জোয়া প্রভুত্বের যুগটার সূত্রপাত করেছিল, তেমনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আমেরিকান যুদ্ধও শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্যের যুগটার সূত্রপাত করবে। আসন্ন যুগের পূর্বাভাষ তারা দেখছে এই ব্যাপারে যে দাসকৃত জাতিকে মুক্ত করার জন্য এবং সমাজব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য অভূতপূর্ব একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেশটাকে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সাধু সন্তান আব্রাহাম লিংকনের ওপর।

ক. মার্কস লেখেন ১৮৬৪ সালের ২২
ও ২৯ নভেম্বরের মধ্যে
ছাপা হয় ১৮৬৫ সালের ৭ নভেম্বর,
১৬৯ নং 'The Bee-Hive Newspaper'
পত্রিকায়

খবরের কাগজের ভাষ্য অনুসারে
অনূদিত

কার্ল মার্কস

প্রুধোঁ প্রসঙ্গে

(ই. বি. শ্‌ভাইৎসার-এর নিকট লিখিত পত্র) (১৪)

লণ্ডন, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৬৫

প্রিয় মহাশয়!

গতকাল আমি একটি চিঠি পেয়েছি, তাতে **প্রুধোঁ** সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে একটি বিস্তারিত অভিমত আপনি চেয়েছেন। আপনার ইচ্ছা পূরণের অন্তরায় হয়েছে আমার সময়াভাব। উপরন্তু তাঁর **কোনো** রচনাও আমার কাছে নেই। যাই হোক, আপনাকে আমার সম্প্রীতি জানাবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া খাড়া করেছি। আপনি তারপর এর সম্পূরণ, সংযোজন, বিযোজন এক কথায় এটিকে নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারেন।*

প্রুধোঁর আদি প্রয়াসের কথা এখন আর আমার মনে পড়ে না। **'সর্বজনীন ভাষা'** (১৬) সম্বন্ধে তাঁর স্কুল জীবনের একটি লেখা থেকে বোঝা যায় যে, যেসব সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর সামান্যতম জ্ঞানেরও অভাব ছিল তাতে হাত দিতে তিনি কত কম ইতস্তত করেছিলেন!

তাঁর প্রথম গ্রন্থ **'সম্পত্তি কী?'** সর্বতোভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য না হলেও, অন্তত যে নতুন এবং উদ্ধত ভঙ্গিতে পুরনো বক্তব্য বলা হয়েছে তার জন্য বইখানা যুগান্তকারী। যেসব ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের রচনা তিনি জানতেন সেখানে অবশ্য **'সম্পত্তি'** শুধু নানাভাবে সমালোচিতই হয় নি, ইউটোপীয় কায়দায় **'নির্মূলও'** হয়েছে। এই বইতে সাঁ-সিমোঁ ও ফুরিয়ের সঙ্গে প্রুধোঁর সম্পর্ক প্রায় হেগেলের সঙ্গে ফয়েরবাখ-এর সম্পর্কেরই মতো। হেগেল-এর সঙ্গে তুলনায় ফয়েরবাখ

---

* কোনো সংশোধন ছাড়া এই চিঠি প্রকাশ করা ভালো বলে মনে করেছি। ['Social-Demokrat' (১৫) **পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর টীকা।**]

আত্যন্তিকভাবেই অকিঞ্চিৎকর। তাসত্ত্বেও তিনি ছিলেন হেগেল-এর **পরবর্তী কালের** পক্ষে যুগান্তকারী, কারণ তিনি এমন কতকগুলি বিষয়ের উপর **জোর দিয়েছিলেন** যেগুলি খ্রীষ্টীয় চেতনার কাছে অপ্রীতিকর অথচ সমালোচনার অগ্রগতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এবং যাদের হেগেল রহস্যময় অর্ধ-অস্পষ্টতার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

প্রুধোঁর এই গ্রন্থখানিতে, বলা যেতে পারে, একটি বলিষ্ঠ পেশীবহুল বাচনভঙ্গি তখনও বজায় ছিল। আর আমার মতে এই বাচনভঙ্গিই এর মুখ্য গুণ। যে কেউ দেখতে পাবেন যে, শুধু পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করার সময়েও প্রুধোঁ যেন নিজস্ব আবিষ্কার উপস্থিত করতেন: তিনি যা বলছেন তা তাঁর নিজের কাছেই নূতন, এবং নূতনের মর্যাদা পাচ্ছে। অর্থশাস্ত্রের 'পূতাধিক পূতের' উপর হস্তক্ষেপের উত্তেজক ঔদ্ধত্য, অপূর্ব আপাতবিরোধী বক্তব্যে বুর্জোয়া মামুলিবুদ্ধিকে ঠাট্টা, সুতীব্র সমালোচনা, তিক্ত বিদ্রূপ, প্রচলিত সমস্ত জঘন্যতার সম্বন্ধে এখানে ওখানে গভীর আন্তরিক রোষ প্রকাশ, বৈপ্লবিক একাগ্রতা — এইসব কিছুর জন্য **'সম্পত্তি কী?'** গ্রন্থখানি পাঠকদের ওপর এক বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থশাস্ত্রের সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে এই গ্রন্থ প্রায় উল্লেখযোগ্যই নয়। কিন্তু এই ধরনের হুজুগে গ্রন্থ যেমন ললিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটা ভূমিকা নেয়। **ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা প্রসঙ্গে'** বইখানির কথাই ধরুন। প্রথম সংস্করণে বইখানি একটি **'হুজুগে পুস্তিকা'** এবং তদুপরি, আদ্যোপান্ত **অন্যের লেখা চুরি ছাড়া** আর কিছু নয়। কিন্তু, তবু, **মানবজাতির মানহানিকর এই বস্তুটির** দ্বারা কী উত্তেজনার না সৃষ্টি হয়েছিল!

আমার হাতের কাছে প্রুধোঁর গ্রন্থটি থাকলে আমি তাঁর অনুসৃত **প্রথম পদ্ধতির** ব্যাখ্যার জন্য সহজেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম। যে অংশগুলি তিনি নিজেই সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতেন সেখানে **অ্যান্টির্নামির** (দ্বন্দ্ব-পরম্পরার) আলোচনায় **কাণ্ট** যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তিনি তারই অনুসরণ করেছেন। প্রুধোঁ অনুবাদের মাধ্যমে একমাত্র যে জার্মান দার্শনিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি কাণ্ট। আর মনে এই ধারণাই প্রবল হয় যে, কাণ্টের পক্ষেও যেমন তাঁর পক্ষেও তেমনি

অ্যান্টিনমির মীমাংসার ব্যাপারটি মানুষের বোধ **'বহির্ভূত'**, অর্থাৎ ব্যাপারটি এমন একটি কিছু যার সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাটাই তমসাচ্ছন্ন।

কিন্তু তাঁর যত কিছু মেকি স্বর্গজয় সত্ত্বেও 'সম্পত্তি কী?' বইখানির মধ্যেও এই স্ববিরোধ চোখে পড়বে যে, প্রুধোঁ একদিকে ছোট জমির মালিক কৃষকের (পরে পেটি বুর্জোয়ার) চোখ দিয়ে ও তার মতবাদ থেকে সমাজের সমালোচনা করছেন, অথচ অন্যদিকে প্রয়োগ করেছেন সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া মাপকাঠি।

বইখানির ত্রুটি একেবারে তার নামকরণের মধ্যেই দেখা যায়। প্রশ্নটা এমন ভ্রান্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া যায় না। **প্রাচীন 'সম্পত্তি-সম্পর্কসমূহ'** লোপ পেয়েছিল **সামন্ততান্ত্রিক** সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে; এবং তারা আবার লোপ পায় **'বুর্জোয়া'** সম্পত্তি-সম্পর্কের ভিতর। এইভাবে ইতিহাস নিজেই অতীত **সম্পত্তি-সম্পর্কের** সমালোচনা চালিয়েছে। প্রুধোঁর আসল বিচার্য বিষয় ছিল **আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তি** — যা আজ বর্তমান। বস্তুটি যে কী, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত কেবল **'অর্থশাস্ত্রের'** সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে যাতে সমগ্র **সম্পত্তি-সম্পর্ক** ধরা হচ্ছে, **ইচ্ছাগত সম্পর্কের আইনগত** অভিব্যক্তি হিসাবে নয়, **উৎপাদন-সম্পর্ক-রূপ** বাস্তব মূর্তিতে। কিন্তু যেহেতু প্রুধোঁ এই সমগ্র অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে **'সম্পত্তির'** সাধারণ আইনগত সংজ্ঞার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাই ১৭৮৯ সালের আগেই এই ধরনের রচনায় **ব্রিসো** একই ভাষায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন (১৭) 'সম্পত্তির অর্থ হল চুরি', তাকে অতিক্রম করতে তিনি পারলেন না।

এর ভিতর থেকে খুব বেশী হলে এইটুকু পাওয়া যেতে পারে যে **'চৌর্য'** সম্বন্ধে বুর্জোয়া আইনী প্রত্যয় বুর্জোয়াদের নিজেদের **'সদুপায়ে'** অর্জিত লাভ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। অপরপক্ষে, যেহেতু **'চৌর্য'** সম্পত্তির বলপূর্বক লঙ্ঘন বললে **সম্পত্তিকেই আগে ধরে নেওয়া হচ্ছে,** সেইহেতু **প্রকৃত বুর্জোয়া সম্পত্তি** সম্বন্ধে প্রুধোঁ সর্বপ্রকার অলীক কল্পনার জালে নিজেকে জড়িয়েছেন যা এমন কি তাঁর নিজের কাছেও দুর্বোধ্য।

১৮৪৪-এ প্যারিসে অবস্থানকালে আমি প্রুধোঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলাম। এখানে এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল

দেওয়াকে ইংরেজরা যে **'মিশ্রণদৃষ্টি'** ['Sophistication'] আখ্যা দিয়ে থাকে, প্রুধোঁর এই মিশ্রণদৃষ্টির জন্য আমিও কিছুটা পরিমাণে দোষী। প্রায়ই সারা রাত্রি ব্যাপী দীর্ঘ বিতর্কের সময় আমি তাঁকে হেগেলীয় মতবাদের দ্বারা সংক্রামিত করে তাঁর ক্ষতি সাধনই করেছিলাম — জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাবে তিনি এবিষয়ে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন নি। প্যারিস থেকে আমার বহিষ্কারের পর, আমি যা শুরু করেছিলাম তা চালিয়ে নিয়ে গেলেন **কার্ল গ্রুন** মহাশয়। জার্মান দর্শনের শিক্ষক হিসেবে আমার চেয়ে তাঁর এই সুবিধা ছিল যে, তিনি নিজেই এ বিষয়ে কিছু বুঝতেন না।

প্রধোঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ **'দারিদ্র্যের দর্শন, ইত্যাদি'** প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিন পূর্বে, তিনি নিজে একখানি অতি বিস্তারিত পত্রে আমার কাছে সে কথা জানান এবং প্রসঙ্গক্রমে লেখেন: 'আমি আপনার কঠোর সমালোচনার প্রত্যাশায় রইলাম।' এই সমালোচনা শীঘ্রই তাঁর উপর গিয়ে পড়ে **(প্যারিস থেকে ১৮৪৭-এ** প্রকাশিত আমার **'দর্শনের দারিদ্র্য, ইত্যাদি'** গ্রন্থে) এমনই ভাবে যে, চিরতরেই আমাদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটে।

আমি এখানে যা বলেছি তা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, **'সম্পত্তি কী?'** এই প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে প্রথম ছিল প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন বা অর্থনৈতিক বিরোধের পদ্ধতি' গ্রন্থখানির মধ্যে। বস্তুত এই পুস্তক প্রকাশের পরেই মাত্র তিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন; আবিষ্কার করেছিলেন যে, তিনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন **গালাগালি** দিয়ে তার জবাব দেওয়া যাবে না, জবাব দেওয়া যাবে একমাত্র আধুনিক **'অর্থশাস্ত্রের' বিশ্লেষণের** মাধ্যমে। একই সময়ে অর্থনৈতিক সংজ্ঞা-বিভাগের প্রণালীকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। **কাণ্টের** অসমাধেয় **'অ্যাণ্টিনমির'** পরিবর্তে বিকাশের পন্থা হিসেবে **হেগেলীয় 'বিরোধ'** প্রবর্তিত করার কথা থাকে তাতে।

প্রত্যুত্তরে লিখিত আমার রচনায় তাঁর দুখানি স্থূলকায় খণ্ডের সমালোচনা আপনি পাবেন। সেখানে অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে আমি দেখিয়েছিলাম বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের অন্তঃস্থলে তিনি কত কম প্রবেশ করেছিলেল; অপরপক্ষে দেখিয়েছিলাম কী ভাবে তিনি নিজেই অনুমানভিত্তিক

দর্শনের মোহ পোষণ করেন, কারণ **অর্থনৈতিক সংজ্ঞাগুলিকে বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশধারার কোনো বিশেষ স্তরের সমানুবর্তী ঐতিহাসিক উৎপাদন-সম্পর্কের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি** হিসেবে না দেখে তিনি সেগুলিকে পূর্ব থেকে বিদ্যমান **চিরন্তন ভাবসংজ্ঞায়** বিকৃত করেছেন, এবং কী ভাবে তিনি এই বাঁকা পথে আবার বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতেই এসে পড়লেন।*

যে অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন সেই 'অর্থশাস্ত্রের' বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত চরম অসম্পূর্ণ, এমন কি স্থানে স্থানে স্কুল-ছাত্র-সুলভ তাও আমি দেখিয়েছি; দেখিয়েছি যে ঐতিহাসিক গতি নিজেই **মুক্তির বাস্তব শর্তাবলী** সৃষ্টি করে তার বিশ্লেষণী জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান গড়ে তোলার পরিবর্তে কী ভাবে তিনি এবং ইউটোপীয়রা ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটি তথাকথিত **'বিজ্ঞান'এর** সন্ধানে — যা থেকে 'সামাজিক সমস্যা সমাধানের' একটি সূত্র সরাসরি বানিয়ে নেওয়া যায়। আর, সমগ্র বিষয়টির ভিত্তি, **বিনিময়-মূল্যের** সম্বন্ধে প্রুধোঁর চিন্তা যে কী পরিমাণ গোলমেলে, ভ্রান্ত ও অপরিপক্ক থেকে গেছে, আর কী ভাবে নূতন একটি বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে তিনি **রিকার্ডোর** মূল্যতত্ত্বের একটি ইউটোপীয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার মতো ভুলও করেন সে বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত সামূহিক অভিমত ব্যক্ত করেছি:

'প্রতিটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি ভাল এবং একটি মন্দ দিক আছে; এটিই হল একমাত্র কথা যেখানে শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ নিজেকে মিথ্যাভাষণে লিপ্ত করেন না। তিনি অর্থতাত্ত্বিকদের দেখানো ভালো দিকটি দেখেন, আবার

---

* 'অর্থতত্ত্ববিদরা যখন বলেন যে, আজকের দিনের সম্পর্ক — বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ — **স্বাভাবিক,** তখন তাঁরা এই অর্থপ্রকাশ-ই করেন যে, সেই সম্পর্কসমূহে প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে পারম্পর্য বজায় রেখেই সম্পদ উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটে। সুতরাং এই সম্পর্কগুলি হল নিজেরা কালের প্রভাব নিরপেক্ষ **প্রাকৃতিক নিয়ম।** এগুলি **শাশ্বত নিয়ম** এবং সমাজকে সর্বকালেই নিয়ন্ত্রণ করবে। সুতরাং ইতিহাস আগে ছিল কিন্তু এখন আর থাকছে না।' (আমার গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠা) [মার্কসের টীকা।]

সমাজতন্ত্রীদের নিন্দিত খারাপ দিকটিও দেখেন। অর্থতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে তিনি ধার করেছেন চিরন্তন অর্থনৈতিক সম্পর্কের আবশ্যিকতা আর সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে ধার করেছেন এই মোহ যে দারিদ্র্যের মধ্যে দারিদ্র্য ছাড়া দর্শনীয় আর কিছু নেই (এর ভিতরের বিপ্লবী, বিধ্বংসী যে দিকটি পুরাতন সমাজের উচ্ছেদসাধন করবে সেই দিকটা না দেখে*)। নিজের পক্ষে বিজ্ঞানের সমর্থন উদ্ধৃত করার প্রচেষ্টায় তিনি এদের উভয়ের সঙ্গেই মতৈক্য পোষণ করেন। বিজ্ঞান তাঁর কাছে ক্ষীণাবয়ব বৈজ্ঞানিক সূত্রমাত্রে পর্যবসিত; তিনি কেবল সূত্র-সন্ধানেই ব্যস্ত। এইভাবেই শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ অর্থশাস্ত্র এবং কমিউনিজম এই দুই-এরই সমালোচনা করেছেন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন — বস্তুত, তিনি এই দুইয়েরই নিচে। অর্থতত্ত্ববিদদের তুলনায় নিচে এই কারণে যে, হাতের কাছে একটি যাদু-সূত্র তৈরি আছে এমন একজন দার্শনিক হিসেবে তিনি মনে করেন নিছক অর্থনৈতিক খুঁটিনাটিগুলিকে তিনি পরিহার করে চলতে পারেন; সমাজতন্ত্রীদের নিচে এই কারণে যে, মননের দিক থেকেও বুর্জোয়া দৃষ্টিসীমার ঊর্ধ্বে নিজেকে তোলার মতো তাঁর সাহসও নেই, অন্তর্দৃষ্টিও নেই। বিজ্ঞানের মানুষ হিসেবে তিনি বুর্জোয়া এবং প্রলেতারীয় উভয়েরই সংস্পর্শের ঊর্ধ্বে আকাশচারী হতে চান; আসলে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে, অর্থশাস্ত্র এবং কমিউনিজমের মধ্যে নিরন্তর দোদুল্যমান **পেটি বুর্জোয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই নন।**'**

উপরের এই অভিমত কঠোর শোনালেও আজও এর প্রতিটি শব্দ আমি অনুমোদন করব। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যখন আমি প্রুধোঁর গ্রন্থখানিকে পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সংহিতা আখ্যা দিয়েছিলাম, এবং তত্ত্বগতভাবে সে কথা প্রমাণ করেছিলাম, তখনও অর্থতত্ত্ববিদরা এবং সমাজতন্ত্রীরা সমস্বরে তাঁকে একজন চরম অতিবিপ্লবী বলে নিন্দিত করছিলেন। ঠিক এই কারণেই পরবর্তীকালেও বিপ্লবের প্রতি তাঁর **'বিশ্বাসঘাতকতা'** নিয়ে সোরগোলে আমি কখনো যোগ দিই নি। প্রথম থেকে তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজেরও উপলব্ধিটাই

* মার্কস এই প্রবন্ধে যোগ করেন বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া কথা। — সম্পাঃ

** উপরোক্ত গ্রন্থ — ১১৯-২০ পৃষ্ঠা। [মার্কসের টীকা।]

ছিল ভ্রান্ত; তাই তিনি যদি অন্যায্য আশাকে নিরাশ করে থাকেন তবে সে দোষ তাঁর নয়।

'সম্পত্তি কী?' গ্রন্থের তুলনায় **'দারিদ্র্যের দর্শন'** বইখানিতে প্রুধোঁর উপস্থাপন পদ্ধতির সব ত্রুটিগুলিই অত্যন্ত প্রতিকূলভাবে প্রকট হয়েছে। প্রকাশভঙ্গি প্রায়শঃ হয়েছে ফরাসীরা যাকে বলে ampoulé*। যেখানেই তাঁর গ্যালিক বিচক্ষণতার ঘাটতি পড়েছে সেখানেই হাজির হয়েছে বাগাড়ম্বরী জল্পনামূলক বুলি, যাকে ভাবা হয়েছে বুঝি জার্মান-দার্শনিক উক্তি। উন্নাসিক, আত্মম্ভরী এবং উদ্ধত সুর, বিশেষ করে **'বিজ্ঞান'** সম্বন্ধে তাঁর বাজে বকুনি, আর তার ভুয়া ভড়ং যা সর্বদাই অতি অপ্রীতিকর তা অবিরত কর্ণকুহর ভারাক্রান্ত করে। তাঁর প্রথম রচনাকে তাপোদ্দীপ্ত করেছিল যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা, তার পরিবর্তে এখানে রীতিমত শব্দালঙ্কার প্রয়োগ করে কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে একটা সাময়িক রুগ্ন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত করুন স্বয়ংশিক্ষিতের আনাড়ী ও বিরক্তিকর পণ্ডিতীপনা — যে স্বয়ংশিক্ষিত ব্যক্তিটির মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার অন্তর্নিহিত গর্ববোধ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে, অথচ যিনি একজন হঠাৎবিজ্ঞানী হিসেবে যা তিনি নন বা যা তাঁর নেই তাই নিয়ে জাঁক করে বেড়ানো দরকার মনে করেন। তারপরে তাঁর পেটি বুর্জোয়া মনোভাব; ফরাসী প্রলেতারিয়েতের প্রতি ব্যবহারিক মনোভাবের জন্য যাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিত, সেই **কাবে-র** মতন লোকের বিরুদ্ধে তিনি চালালেন অভদ্র জানোয়ারের মতো আক্রমণ — যে আক্রমণে না আছে তীক্ষ্ণতা, না আছে গভীরতা, না আছে ন্যায্যতা, আর অপরদিকে তিনি সৌজন্য দেখালেন **দ্যুনুয়ার** মতো লোকের প্রতি (অবশ্য তিনি হলেন 'রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা'); অথচ এই লোকটির তাবৎ গুরুত্ব হল তাঁর হাস্যোদ্দীপক সেই গাম্ভীর্য যে গাম্ভীর্য সহকারে তিনটি স্থূলকায় অসহ্য বিরক্তিকর গ্রন্থখণ্ডের (১৮) মাধ্যমে তিনি প্রচার করেছেন এক কৃচ্ছ্রসাধনবাদ [rigourism] যাকে হেলভেশিয়াস বর্ণনা করেছেন এইভাবে: 'হতভাগ্যেরা হবে নিখুঁত — এটাই দাবি।'

প্রুধোঁর পক্ষে নিশ্চয়ই এক অতি অসুবিধাজনক মুহূর্তে এসেছিল

---

* বাগাড়ম্বরপূর্ণ। — সম্পাঃ

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (১৯), কারণ তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, '**বিপ্লবের যুগ**' চিরতরেই শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় সভায় তাঁর উক্তিসমূহের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যত কমই অন্তর্দৃষ্টি দেখা যাক না কেন, সেগুলি সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় (২০)। জুন অভ্যুত্থানের পর (২১) সে বক্তব্য ছিল প্রচণ্ড সাহসের কাজ। তা ছাড়া তার সুফল হল এই যে, প্রুধোঁর প্রস্তাব সমষ্টির বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত **তিয়ের** তাঁর বক্তৃতায় (২২), পরে যা বিশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সমগ্র ইউরোপের কাছে প্রমাণ করে দিলেন কী শিশুসুলভ প্রশ্নোত্তরিকা [catechism] ফরাসী বুর্জোয়াদের এই আধ্যাত্মিক স্তম্ভটির পাদপীঠ হিসেবে কাজ করছিল। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীযুক্ত **তিয়ের-এর** তুলনায় **প্রুধোঁ** স্ফীত হয়ে যেন প্রাকপ্লাবন যুগের অতিকায় জীবের আয়তন লাভ করেন।

প্রুধোঁর সর্বশেষ অর্থশাস্ত্রবিষয়ক 'কীর্তি' হল তাঁর '**বিনাসুদে ক্রেডিট**' এবং তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো '**জনগণের ব্যাঙ্কের**' আবিষ্কার। বুর্জোয়া 'অর্থশাস্ত্রের' প্রথম উপাদান, অর্থাৎ **পণ্য ও মুদ্রার** সম্পর্কটি বুঝবার অক্ষমতা থেকেই যে তাঁর ধারণার তত্ত্বগত ভিত্তির উদ্ভব, অথচ তার ব্যবহারিক উপরিকাঠামোটা যে ঢের বেশী পুরনো ও অনেক বেশী ভালো বিকশিত পরিকল্পনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার প্রমাণ আমার **'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' প্রথম খণ্ড,** বার্লিন, ১৮৫৯, গ্রন্থেই (পৃঃ ৫৯-৬৪) পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থায় ক্রেডিট-প্রথা যে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ত্বরান্বিত করার সহায়ক হতে পারে যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ আঠারো শতকের সূচনায়, আবার পরে উনিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে তা এক শ্রেণীর কাছ থেকে আর এক শ্রেণীর কাছে সম্পদ হস্তান্তরের সহায়ক হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহেই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু **সুদ-দায়ী পুঁজিকেই পুঁজির প্রধানরূপ** বলে গণ্য করা, ক্রেডিট-প্রথার একটি বিশেষ ধরনের প্রয়োগকে, অর্থাৎ সুদের তথাকথিত বিলোপ সাধনকে, সমাজ রূপান্তরের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে চাওয়া একেবারে পুরোপুরি **কূপমণ্ডূক** কল্পনাবিলাস। বস্তুত এই কল্পনা, আরো দীর্ঘায়িত রূপে **সতেরো শতকের ইংরেজ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুখপাত্রদের মধ্যে** আগেই পাওয়া গেছে। সুদ-বিশিষ্ট পুঁজি বিষয়ে (২৩) বাস্তিয়ার সঙ্গে

প্রুধোঁর বাদানুবাদ (১৮৫০) **'দারিদ্র্যের দর্শনের'** থেকে অনেক নিম্নস্তরের। তিনি এমন অবস্থা তৈরী করেন যে এমন কি বাস্তিয়ার হাতেও মার খেতে হয়; প্রতিপক্ষ যখন তাঁর উপর মোক্ষম আঘাত হানে তিনি তখন ভাঁড়ামি করে হেহে করে ওঠেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে প্রুধোঁ — আমার মনে হয়, লসান সরকারের নির্দেশক্রমেই — **'করনীতি'** বিষয়ে একটি পুরস্কার-প্রার্থী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এখানে প্রতিভার শেষ দীপ্তিটুকুও নির্বাপিত। নিখাদ **নিছক পেটি বুর্জোয়া** ছাড়া আর কিছুই এখানে বাকি রইল না।

আর তাঁর রাজনৈতিক ও দর্শন সম্বন্ধীয় যা রচনা — তার সবকটির মধ্যেই তাঁর অর্থতত্ত্বসংক্রান্ত রচনার মতো এই একই স্ববিরোধী এবং দ্বৈত চরিত্র প্রকট। উপরন্তু, সেগুলির উপযোগিতা একান্তই স্থানিক, ফ্রান্সের মধ্যেই সীমিত। এ সব সত্ত্বেও যে যুগে ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা ধার্মিকতায় আঠারো শতকের বুর্জোয়া ভল্টেয়র-পন্থা অথবা উনিশ শতাব্দীর জার্মান নিরীশ্বরতার তুলনায় উন্নততর প্রতিপন্ন হওয়া কাম্য মনে করত, সেযুগে ধর্ম এবং গির্জার উপর তাঁর আক্রমণের বিরাট স্থানীয় তাৎপর্য ছিল। মহান পিটার যদি রুশ বর্বরতাকে পরাস্ত করে থাকেন বর্বরতা দিয়ে তবে প্রুধোঁও ফরাসী বাগাড়ম্বরকে বাক্যছটায় পরাজিত করার জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন।

'ক্ষমতা জবরদখল' বিষয়ক যে রচনায় লুই বোনাপার্টকে নিয়ে তিনি দহরম-মহরম করেছিলেন ও প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ফরাসী শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান; এবং **পোল্যান্ডের** (২৪) বিরুদ্ধে লেখা তাঁর সর্বশেষ যে রচনায় তিনি জারের মহিমা কীর্তনের জন্যই চরম ক্লীবতাগ্রস্ত নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিয়েছেন, সে দুটি রচনাকে শুধু খারাপ নয়, ইতর লেখা বলেই নিশ্চয় অভিহিত করতে হবে; সে ইতরতা অবশ্য পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুবর্তী।

প্রুধোঁকে প্রায়ই **রুসোর** সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর চেয়ে ভ্রান্ত আর কিছুই হতে পারে না। তিনি বরং **নিকোলা লেংগে-রই** সমগোত্র, প্রসঙ্গত, যাঁর বই **'দেওয়ানী আইনের তত্ত্ব'** খুবই দীপ্তিমান লেখা।

দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের দিকে প্রুধোঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি কখনো প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নি

সেইহেতুই তিনি কূটতর্কের বেশি আর গেলেন না। বস্তুত তাঁর পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই এটি জড়িয়েছিল। ইতিহাসকার **রাউমার** মতোই পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিটিই হল 'একদিকে একথা অপরদিকে সেকথা' দিয়ে গঠিত। এটা আছে তার অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এবং **সেই কারণেই** তাঁর রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতেও। নীতিবোধের বেলায় তাই, সর্বত্রই তাই। সে হল জীবন্ত স্ববিরোধ। তদুপরি, প্রুধোঁর মতো যদি সে বুদ্ধিমান লোক হয়, তবে অবিলম্বেই সে নিজের বিরোধগুলি নিয়ে খেলতে শিখবে এবং অবস্থানুসারে তাকে পরিণত করবে চিত্তাকর্ষক, জমকালো কখনো যাচ্ছেতাই, কখনো বা দীপ্যমান অসঙ্গতিতে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতুড়েপনা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আপোসসন্ধান হচ্ছে এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এর একটি মাত্রই নিয়ামক উদ্দেশ্য থাকে -- সে উদ্দেশ্য হল কর্তার **অহমিকা;** আর সমস্ত অহংসর্বস্ব মানুষের মতো তার একমাত্র প্রশ্নটা হল বর্তমান মুহূর্তের সাফল্য, দিনের হুজুগ। এইরূপে অনিবার্যভাবেই সেই সাধারণ নৈতিক শালীনতাটুকুও মিলিয়ে যায়, যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্ষমতাধিকারীদের সঙ্গে আপোসের ছায়াটা থেকেও রুসোকে দূরে রাখতে পেরেছিল।

সম্ভবত ফ্রান্সের বিকাশের এই সর্বাধুনিক পর্যায়কে উত্তরপুরুষ এই বলেই বিশেষিত করবে যে, লুই বোনাপার্ট ছিলেন তার নেপোলিয়ন এবং প্রুধোঁ হলেন তার রুসো-ভল্টেয়র।

এবার ভদ্রলোকের মৃত্যুর পরে এত তাড়াতাড়ি আপনি যে আমাকে তাঁর মরণোত্তর বিচারকের ভূমিকার ভার চাপালেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

আপনাদের অতি বিশ্বস্ত **কার্ল মার্কস**

১৮৬৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে লিখিত

১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারির ১, ৩ ও ৫ তারিখের ১৬, ১৭ ও ১৮ নং 'Social-Democrat' পত্রিকায় প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে ১৮৮৫ সালের সংস্করণ মুদ্রণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা

জার্মান থেকে অনূদিত ইংরেজি ভাষার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

মজুরি দাম মুনাফা (২৫)

প্রারম্ভিক মন্তব্য

নাগরিকগণ,

আলোচ্য বিষয়ে যাবার আগে আপনাদের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি প্রারম্ভিক মন্তব্য করব।

ইউরোপীয় মহাদেশ জুড়ে এখন বাস্তবিকই সংক্রামক আকারে ধর্মঘট চলেছে ও মজুরি-বৃদ্ধির সার্বজনীন দাবি উঠছে। আমাদের কংগ্রেসে (২৬) এ প্রশ্ন উঠবে। আন্তর্জাতিক সমিতির নেতা হিসেবে আপনাদের এই একান্ত জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে স্থির মত থাকা উচিত। আপনাদের ধৈর্যের উপরে কড়া রকম জবরদস্তি করার ঝুঁকি নিয়েও আমার তরফ থেকে তাই আমি এ প্রসঙ্গের পূর্ণ আলোচনা করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।

নাগরিক ওয়েস্টন সম্পর্কে গোড়াতেই আর একটা মন্তব্য আমায় করতে হচ্ছে। তিনি শুধু যে আপনাদের কাছে কতগুলি মতামত হাজির করেছেন তা নয়, প্রকাশ্যে সে মতামত সমর্থনও করেছেন, যেগুলি তাঁর ধারণায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে হলেও শ্রমিক শ্রেণীর কাছে অতি অপ্রিয় বলে তিনি জানেন। এ ধরনের নৈতিক সাহস প্রদর্শন আমাদের সকলের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আমি আশা করি যে, আমার নিবন্ধের অমার্জিত ধরন সত্ত্বেও এর উপসংহারে তিনি দেখতে পাবেন, তাঁর থিসিসগুলির মূলে যেটুকু খাঁটি ভাবনা আছে তাকে সত্য বলে আমি মনে করি, তার সঙ্গে আমি একমত, যদিও তার বর্তমান আকারে সে থিসিসগুলিকে আমি তত্ত্বের দিক থেকে ভুল ও কার্যক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে মনে না করে পারছি না।

এবারে আমি সরাসরি আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়টি শুরু করব।

১। উৎপাদন ও মজুরি

নাগরিক ওয়েস্টনের যুক্তি আসলে নির্ভর করছে দুটি প্রতিজ্ঞার উপরে:

প্রথমত, **জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ** হচ্ছে **একটি স্থির নির্দিষ্ট বস্তু**, যা হল **অপরিবর্তিত** পরিমাণ, গাণিতিকেরা যাকে বলবেন **স্থির** [constant] রাশি বা পরিমাণ;

দ্বিতীয়ত, **আসল মজুরির পরিমাণ**, অর্থাৎ তা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য কেনা চলে তার হিসাবে মাপা মজুরির পরিমাণ হচ্ছে একটা **অপরিবর্তনশীল** রাশি, একটা **স্থির** পরিমাণ।

তাঁর প্রথম উক্তিটি স্পষ্টতই ভুল। আপনারা দেখতে পারেন, বছরের পর বছর উৎপন্নের মূল্য ও পরিমাণ বেড়ে চলেছে, জাতীয় শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বাড়ছে এবং এই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সঞ্চালনের জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, ক্রমাগতই তার পরিবর্তন ঘটছে। বছর-শেষের হিসাবে যা সত্য, বিভিন্ন বছরের তুলনামূলক হিসাবে যা সত্য — বছরের প্রতিটি গড়পড়তা দিনের পক্ষেও তা-ই সত্য। জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বা আয়তন নিরন্তর বদলাচ্ছে। এটি **স্থির** নয়, বরং এটি একটা **পরিবর্তনশীল** পরিমাণ, আর জনসংখ্যায় পরিবর্তনের কথা না ধরলেও **পুঁজি সঞ্চয়** ও **শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে** ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটনের দরুন তা পরিবর্তনশীল না হয়ে পারে না। একথা খুবই ঠিক যে, আজ যদি **মজুরির সাধারণ হার বৃদ্ধি** পায় তবে তার পরিণাম ফল যাই হোক না কেন ঐ বৃদ্ধি **আপনা থেকেই, অবিলম্বে** উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাবে না। প্রথমে বর্তমান অবস্থা থেকেই তার যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু মজুরি-বৃদ্ধির **আগে** জাতীয় উৎপন্ন যদি **স্থির** না হয়ে **পরিবর্তনশীল** থেকে থাকে, তবে মজুরি-বৃদ্ধির **পরেও** তা স্থির না থেকে পরিবর্তনশীল হয়েই থাকবে।

কিন্তু ধরুন, জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ **পরিবর্তনশীল** না হয়ে **স্থিরই** আছে। সে ক্ষেত্রেও বন্ধু ওয়েস্টন যাকে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচনা করছেন, তা এক অযৌক্তিক ঘোষণাই থেকে যাবে। যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া থাকে, ধরুন আট, তাহলে এই সংখ্যাটির **অনপেক্ষ** সীমা আছে বলে

তার অংশগুলির **আপেক্ষিক সীমার** পরিবর্তন আটকায় না। যদি মুনাফা ছয় ও মজুরি দুই হয়, তবে মজুরি বেড়ে ছয় ও মুনাফা কমে দুই হতে পারে, কিন্তু তখনও মোট সংখ্যাটি থাকবে আট-ই। কাজেই, উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলেই তার থেকে কোনো ক্রমেই প্রমাণিত হয় না যে মজুরির মাত্রাও স্থির। বন্ধু ওয়েস্টন তাহলে মজুরির মাত্রার স্থিরতা প্রমাণ করছেন কী করে? শুধু তা জোর গলায় ঘোষণা করেই।

কিন্তু তাঁর ঘোষণা যদি মেনেও নেওয়া যায় তবে দু-দিকেই তা কাটবে, অথচ তিনি কেবল একদিকেই জোর দিচ্ছেন। মজুরির পরিমাণ যদি একটা স্থির রাশি হয় তবে তাকে বাড়ানোও যায় না, কমানোও যায় না। কাজেই, যদি জোর করে সাময়িকভাবে মজুরি বাড়ানো মজুরদের পক্ষে বোকামি হয়, তবে জোর করে সাময়িকভাবে মজুরি কমানো পুঁজিপতিদের পক্ষেও কম নির্বুদ্ধিতা নয়। বন্ধুবর ওয়েস্টন অস্বীকার করেন না যে, অবস্থাবিশেষে মজুরেরা জোর করে মজুরি বাড়িয়ে নিতে **পারে** বটে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ স্বভাবতই নির্দিষ্ট থাকার ফলে এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। অপরপক্ষে, এও তিনি জানেন যে, পুঁজিপতিরা জোর করে মজুরি কমাতে **পারে,** আর বস্তুত তারা অনবরতই সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মজুরির স্থিরতার নীতি অনুসারে এক্ষেত্রেও যতটুকু প্রতিক্রিয়া ঘটা উচিত, প্রথম ক্ষেত্রের থেকে তা মোটেই কম নয়। সুতরাং, মজুরি হ্রাস কিংবা তার চেষ্টার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মজুরেরা ঠিক কাজই করবে। আর জোর করে **মজুরি-বৃদ্ধির** জন্য সংগ্রাম করে তারা ঠিকই করবে, কারণ মজুরি-হ্রাসের বিপক্ষে প্রত্যেকটি **প্রতিক্রিয়া** হচ্ছে মজুরি-বৃদ্ধির স্বপক্ষে **ক্রিয়াস্বরূপ**। অতএব নাগরিক ওয়েস্টনের নিজস্ব **মজুরি স্থিরতার** নীতি অনুসারেই মজুরদের উচিত অবস্থাবিশেষে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও সংগ্রাম করা।

এ সিদ্ধান্ত তিনি যদি না মানেন তবে যে প্রতিজ্ঞা থেকে এর উদ্ভব সেটিকেই তাঁকে অস্বীকার করতে হবে। মজুরির পরিমাণ একটা **স্থির রাশি** বলা তাঁর চলবে না, বরং তাঁকে বলতে হবে যে, যদিও মজুরি **বাড়তে** পারে না ও **বাড়া** উচিত নয় তবুও পুঁজির তরফ থেকে যখনই মজুরি কমানোর মর্জি হবে তখনই তা **কমানো** যেতে পারবে ও তাকে **কমতে** হবে। পুঁজিপতির যদি খুশি হয় আপনাকে মাংসের বদলে আলু আর গমের বদলে জই খাইয়ে

রাখবে, তবে তার সেই খেয়ালকেই ধরতে হবে অর্থশাস্ত্রের নিয়ম বলে ও তা মেনে নিতে হবে। এক দেশের মজুরির হার যদি আর এক দেশের তুলনায় বেশি হয়, যেমন ধরা যাক, যুক্তরাষ্ট্রের হার যদি ইংলণ্ডের তুলনায় বেশি হয়, তবে মজুরির হারের এই তফাৎটাকে আপনাকে মার্কিন পুঁজিপতি ও ইংরেজ পুঁজিপতির মর্জির তফাৎ বলেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এ পদ্ধতি শুধু অর্থনৈতিক ঘটনাবলী নয়, অন্যান্য সবরকম ঘটনার পর্যালোচনাকেও নিশ্চয় ভারি সহজ করে দেবে।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি: মার্কিন পুঁজিপতির মর্জি ইংরেজ পুঁজিপতির মর্জি থেকে ভিন্ন হয় **কেন?** আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আপনাকে যেতে হবে **মর্জির** আওতা ছাড়িয়ে। কোনো পাদ্রি হয়ত আমায় বলতে পারেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ফ্রান্সে একরকম, ইংলণ্ডে অন্যরকম। এবম্বিধ দ্বৈত ইচ্ছা কেন বুঝিয়ে দেবার জন্য জেদ করলে তিনি হয়ত নির্লজ্জভাবে বলে বসবেন যে, ফ্রান্সে একরকম ইচ্ছা আর ইংলণ্ডে অন্যরকম ইচ্ছা থাকাটাই ঈশ্বরের মর্জি। কিন্তু বন্ধু ওয়েস্টন নিশ্চয়ই যুক্তিকে এভাবে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে কথা বলার মতো লোক নন।

যতদূর সম্ভব আদায় করে নেওয়াই অবশ্য পুঁজিপতির **মর্জি**। আমাদের উচিত, পুঁজিপতির **মর্জির** কথা তোলা নয়, তার **ক্ষমতা, সে-ক্ষমতার সীমা** ও **সেই সব সীমার চরিত্র** সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

২। উৎপাদন, মজুরি, মুনাফা

নাগরিক ওয়েস্টন যে-ভাষণ পড়ে আমাদের শোনালেন সেটা খুব সংক্ষেপেই বলা যেত।

তাঁর সমস্ত যুক্তিটা দাঁড়াচ্ছে এই: শ্রমিক শ্রেণী যদি আর্থিক মজুরি হিসেবে চার শিলিং-এর জায়গায় পাঁচ শিলিং দিতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাধ্য করে তবে পণ্য হিসেবে পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং-এর বদলে দেবে চার শিলিং মূল্যের জিনিস। মজুরি বাড়বার আগে শ্রমিক শ্রেণী চার শিলিং দিয়ে যা কিনত, এখন তার জন্য পাঁচ শিলিং খরচ করতে হবে। কিন্তু কেন

এমন হবে? কেন পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং-এর বিনিময়ে মাত্র চার শিলিং মূল্যের জিনিস দেবে? কারণ মোট মজুরির পরিমাণ হচ্ছে নির্দিষ্ট। কিন্তু চার শিলিং মূল্যের পণ্যের পরিমাণেই বা তা নির্দিষ্ট কেন? কেন তিন, দুই বা অন্য কোনো মূল্যের পণ্যের পরিমাণে তা আবদ্ধ নয়? মজুর ও পুঁজিপতি এই উভয়েরই ইচ্ছা নিরপেক্ষ এক অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা যদি মজুরির পরিমাণের মাত্রা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে নাগরিক ওয়েস্টনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল সে নিয়মকে বিবৃত ও প্রমাণিত করা। তাছাড়া এও তাঁর প্রমাণ করা উচিত ছিল যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তবিশেষে যে পরিমাণ মজুরি বাস্তবিকই দেওয়া হয়ে থাকে তা সর্বদাই আবশ্যিক মজুরির পরিমাণের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় — একচুল এদিক ওদিক হয় না। অপর পক্ষে, মজুরির পরিমাণের ঐ বিশেষ মাত্রা যদি পুঁজিপতির **মর্জিমাত্রের** উপরে অথবা তার অর্থলোভের মাত্রার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে তা এক মন-গড়া মাত্রা। তার মধ্যে আবশ্যিক কিছু নেই। পুঁজিপতির মর্জি **অনুসারে** সেই মাত্রা বদলে যেতে পারে — সুতরাং পুঁজিপতির মর্জির **বিরুদ্ধেও** এই মাত্রা বদলানো যায়।

নাগরিক ওয়েস্টন তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে আপনাদের কাছে উদাহরণ দিয়েছেন এই বলে যে, একটি পাত্রে যখন নির্দিষ্ট কয়েকজন লোকের খাওয়ার মতো কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ শুরুয়া থাকে, তখন চামচগুলিকে চওড়ার দিকে বাড়ানোর ফলে শুরুয়ার পরিমাণ বাড়ে না। এই দৃষ্টান্তকে যদি আমি বেকুবি* বলে মনে করি, তবে কিন্তু আমায় মাপ করতে হবে। এতে মেনেনিয়াস এ্যাগ্রিপ্পা যে উপমা প্রয়োগ করেছিলেন, খানিকটা সে কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। রোমের সাধারণ জন যখন রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানে তখন অভিজাত এ্যাগ্রিপ্পা তাদের বলেন যে, অভিজাতরূপী উদরটাই রাষ্ট্রদেহের সাধারণ লোকরূপ অন্যান্য অঙ্গকে আহার্য জোগায়। এ্যাগ্রিপ্পা অবশ্য দেখাতে পারেন নি যে, একজনের পেট ভর্তি করে অপর একজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট করা চলতে পারে। নাগরিক ওয়েস্টন তেমনি ভুলে গেছেন

---

* ইংরেজিতে এখানে শব্দের খেলা আছে: spoon — 'চামচ', 'সাদাসিধে ব্যক্তি' আর spoony — 'বোকা', 'বেকুব'। — সম্পাঃ

যে, মজুরেরা যে পাত্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে তা গোটা জাতীয় শ্রমের উৎপন্ন দিয়েই পূর্ণ, আর তা থেকে তারা যে আরও বেশি নিতে পারছে না তার কারণ হল পাত্রের সংকীর্ণতা নয়, তার ভিতরকার জিনিসের স্বল্পতাও নয়, বরঞ্চ তাদের চামচের ক্ষুদ্রতাই।

পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং নিয়ে চার শিলিং মূল্যের জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারে কী কৌশলে? সে যে পণ্য বিক্রি করে তার দাম বাড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু পণ্যের দাম বৃদ্ধি, আরো সাধারণভাবে বললে, ঐ দামের কোনো পরিবর্তন, পণ্যের দাম জিনিসটাই কি নিতান্ত পুঁজিপতির ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে? নাকি সে ইচ্ছা সফল হতে হলে বিশেষ কতকগুলি অবস্থার প্রয়োজন? তা না হলে বাজার-দরের ওঠানামা, তার নিরন্তর হ্রাসবৃদ্ধি এক অভেদ্য রহস্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা যখন ধরে নিয়েছি, শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে বা নিয়োজিত পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণে বা যে-মুদ্রায় উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য প্রকাশিত হয় তার দামে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, **পরিবর্তন** ঘটেছে **শুধু মজুরির হারেই,** তখন এই **মজুরি-বৃদ্ধি** কী ভাবে **পণ্যের দামকে** প্রভাবিত করতে পারবে? পারবে শুধু এসব পণ্যের চাহিদার সঙ্গে যোগানের বাস্তব অনুপাতের উপর প্রভাব বিস্তার করেই।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, সমগ্রভাবে বিচার করলে শ্রমিক শ্রেণী **আবশ্যিক দ্রব্যাদি** ক্রয়ের খাতে তার আয় খরচ করে ও খরচ করতে হয়। কাজেই, সাধারণভাবে মজুরি বাড়লে **আবশ্যিক দ্রব্যাদির** চাহিদাও বেড়ে যায় এবং ফলে **সেগুলির বাজার-দরও** বাড়ে। যে পুঁজিপতিরা এইসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি তৈরি করে তারা তাদের পণ্যের চড়তি বাজার-দরের ফলে বাড়তি মজুরির খরচা পুষিয়ে নেয়। কিন্তু যেসব পুঁজিপতি এইসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে **না** তাদের ক্ষেত্রে কী হবে? ভাববেন না যে সংখ্যায় তারা অল্প। একবার ভাবুন তো যে, জাতীয় উৎপন্নের দুই-তৃতীয়াংশ ভোগ করছে জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মানুষ। কমন্স সভায় একজন সভ্য সম্প্রতি বলেছেন যে, এরা হল জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ মাত্র। তাহলে বুঝবেন যে, জাতীয় উৎপাদনের কী বিপুল অংশ বিলাসদ্রব্য হিসেবে উৎপন্ন হয় বা বিলাসদ্রব্যের জন্য **বিনিময় করা হয়** এবং কী বিপুল পরিমাণ আবশ্যিক

দ্রব্যাদি অপচয় করা হয় চাপরাশী, ঘোড়া, বিড়াল প্রভৃতির পিছনে। এই অপব্যয় যে আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই বহুলাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে — এ কথা তো আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

তাহলে যেসব পুঁজিপতি আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদন **করে না** তাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? সাধারণভাবে মজুরি বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের **মুনাফার হার যেটুকু কমে যায়, নিজেদের উৎপন্ন পণ্যের দর বাড়িয়ে** তারা কিন্তু সেটুকু পুষিয়ে নিতে পারে না, কারণ ঐ সব পণ্যের চাহিদা তো আর বাড়ে নি। তাদের আয় যাবে কমে আর ঐ কমতি আয় থেকে বাড়তি দামের আবশ্যিক দ্রব্যাদি আগের মতো পরিমাণে কিনতে গিয়ে আরো বেশি টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আয় হ্রাস পেল বলে বিলাসদ্রব্যের জন্য ব্যয়ের খাতে তাদের টান ধরবে, আর তাই তাদের নিজ নিজ পণ্যের পারস্পরিক চাহিদা যাবে কমে। এই চাহিদা হ্রাসের ফলে তাদের পণ্যের দাম কমতে থাকবে। সুতরাং শিল্পের এইসব শাখায় **মুনাফার হার কমে যাবে** — কমে যাবে কেবল সাধারণ মজুরি-হার বৃদ্ধির সরল অনুপাতে নয়, সাধারণ মজুরি-বৃদ্ধি, আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি ও বিলাসদ্রব্যের দাম হ্রাসের চক্রবৃদ্ধি হারেও।

শিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত পুঁজির **মুনাফার হারে এই তারতম্যের** ফল কী হতে পারে? যখনই, যে-কোনো কারণেই হোক, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে **মুনাফার গড়পড়তা হার** বিভিন্ন হলে সাধারণত যা ঘটে থাকে, এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য তাই হবে। কম লাভজনক থেকে বেশি লাভজনক শাখায় পুঁজি ও শ্রম স্থানান্তরিত হতে থাকবে এবং এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলবে যতক্ষণ না শিল্পের এক শাখার পণ্য-যোগান বর্ধিত চাহিদা অনুপাতে বেড়ে উঠছে এবং অপর শাখার পণ্য-যোগান পড়তি চাহিদা অনুযায়ী কমে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন ঘটার পর বিভিন্ন শাখায় মুনাফার সাধারণ হার আবার **সমীকৃত** হবে। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের অনুপাতের একটা পরিবর্তন থেকেই যেহেতু সমস্ত অব্যবস্থাটা গোড়ায় শুরু হয়েছিল, তাই কারণটুকু চলে গেলে তার ফলাফলও থাকবে না, ফলে **দামগুলি** আবার তাদের পুরানো স্তরে ও সাম্যাবস্থায় ফিরে যাবে। মজুরি-বৃদ্ধির ফলে **মুনাফার হার হ্রাস** শ্রমশিল্পের কয়েকটি শাখায় সীমাবদ্ধ না থেকে তখন হয়ে দাঁড়াবে **সাধারণ**। যে অবস্থা আমরা ধরে নিয়েছি সেই দিক থেকে কথাটা দাঁড়াল এই —

শ্রমের উৎপাদন-শক্তির কোনো বদল হচ্ছে না, উৎপন্নের মোট পরিমাণেরও বদল হচ্ছে না, **কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের রূপটা বদলে যাচ্ছে।** উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ এখন থাকবে আবশ্যিক দ্রব্যাদির আকারে, ক্ষুদ্রতর অংশ থাকবে বিলাসদ্রব্যের রূপে। অথবা যা একই কথা, বিদেশী বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্রতর অংশ বিনিময় হবে ও তার আদি আকারেই ভোগে আসবে, অর্থাৎ ঐ একই কথা, দেশের উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় না হয়ে বিনিময় হবে বিদেশী আবশ্যিক দ্রব্যাদির সঙ্গে। সুতরাং মজুরির হার সাধারণভাবে বেড়ে গেলে বাজার-দরের একটা সাময়িক বিচলিতির পর তার ফল হয় শুধু মুনাফা হারের একটা সাধারণ পড়তি, পণ্যের দামে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে না।

যদি বলা হয় যে, পূর্ববর্তী যুক্তিতে আমি ধরে নিয়েছি সমস্ত বাড়তি মজুরিই আবশ্যিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের খাতে ব্যয় হচ্ছে, তাহলে জবাব দেব যে, আমি নাগরিক ওয়েস্টনের মতের পক্ষে সব থেকে অনুকূল অবস্থাটিই ধরেছি। মজুরেরা আগে ব্যবহার করত না এমন জিনিসপত্রের জন্য যদি বাড়তি মজুরি ব্যয় করা হয় তবে তাদের ক্রয়ক্ষমতা যে সত্যসত্যই বেড়েছে তার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধি পাওয়াতেই এর উৎপত্তি বলে মজুরের ক্রয়ক্ষমতা যতটুকু বাড়ে পুঁজিপতিদের ক্রয়ক্ষমতা ঠিক ততটুকু কমে যাওয়া চাই। অতএব পণ্যসম্ভারের **মোট চাহিদা বাড়বে না,** কিন্তু ঐ চাহিদার বিভিন্ন অংশে **পরিবর্তন ঘটবে।** একদিকে বাড়তি চাহিদার তাল সামলাবে অন্যদিকের কমতি চাহিদা। কাজেই, মোট চাহিদা সমান থাকায় পণ্যসম্ভারের বাজার-দরের কোনোরকম পরিবর্তন ঘটতে পারবে না।

সুতরাং আপনারা দাঁড়াবেন এই উভয়সংকটের মুখোমুখি: হয়, বাড়তি মজুরি সবরকম ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য সমানভাবে ব্যয় হবে; সেক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর তরফের চাহিদা-স্ফীতি পুঁজিপতি শ্রেণীর তরফের চাহিদা-সঙ্কোচনের দ্বারা সমতা বজায় রাখবে। নয়তো, বাড়তি মজুরি ব্যয় হবে শুধু কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য ক্রয়ের খাতেই; সেক্ষেত্রে সেই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বাজার-দর সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে শিল্পের কোনো কোনো শাখায় মুনাফা-হারের বৃদ্ধি ও অন্যান্য শাখায় মুনাফা-হার হ্রাসের জন্য পুঁজি ও শ্রমের বণ্টনে পরিবর্তন ঘটবে এবং তা চলতে থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না পণ্য-

যোগান শিল্পের এক শাখায় বর্ধিত চাহিদার স্তর অবধি ওঠে এবং অন্যান্য শাখায় হ্রাসপ্রাপ্ত চাহিদার স্তর পর্যন্ত নেমে আসে। প্রথম সম্ভাবনা মেনে নিলে পণ্যের দামের কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্বিতীয়টি অনুসারে, বাজার-দরের কিছুটা ওঠানামার পর পণ্যের বিনিময়-মূল্য পুরনো স্তরে ফিরে যাবে। উভয় অবস্থাতেই মজুরি হারের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত মুনাফা-হারের সাধারণ হ্রাস ছাড়া আর কিছু ঘটবে না।

আপনাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নাগরিক ওয়েস্টন অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনারা যেন ভেবে দেখেন ইংলণ্ডের কৃষি-মজুরি সার্বজনীনভাবে নয় শিলিং থেকে আঠারো শিলিং পর্যন্ত বেড়ে গেলে তার ফলাফল কী মুশকিল ঘটাবে। সাবেগে তিনি বলে উঠেছেন, আবশ্যিক দ্রব্যাদির চাহিদার বিপুল বৃদ্ধি ও তারই ফল হিসাবে ভয়াবহ দাম বৃদ্ধির কথা একবার ভেবে দেখুন! কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, মার্কিন কৃষি-মজুরের গড়পড়তা মজুরি ইংরেজ কৃষি-মজুরের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি, যদিও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপন্নের দর ইংলণ্ড থেকে কম, যদিও যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজি ও শ্রমের সাধারণ সম্পর্ক ইংলণ্ডের মতোই এবং যদিও ইংলণ্ডের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ অনেক কম। তবে কেন আমাদের বন্ধু এই পাগলা ঘণ্টি বাজাচ্ছেন? শুধু আমাদের সামনেকার আসল প্রশ্নটিকে সরিয়ে দেবার জন্যই। হঠাৎ নয় শিলিং থেকে আঠারো শিলিং মজুরি বাড়া হচ্ছে সহসা শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি। ইংলণ্ডে মজুরির সাধারণ হার হঠাৎ শতকরা ১০০ ভাগ বাড়তে পারে কিনা আমরা এখানে মোটেই সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বৃদ্ধির **পরিমাণের** সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই — সে পরিমাণ প্রত্যেকটি বাস্তব দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট অবস্থার উপরে নির্ভর করবে ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে। আমাদের দেখতে হবে শুধু মজুরি-হারের সাধারণ বৃদ্ধি, এমন কি যদি তা শতকরা একভাগের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলেও তার ক্রিয়া কী হবে।

বন্ধুবর ওয়েস্টনের কল্পনাপ্রসূত শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধির কথা ছেড়ে দিয়ে আমি গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সত্যসত্যই মজুরির যে বৃদ্ধি ঘটেছিল তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আপনারা সকলেই ১৮৪৮ সাল থেকে যে দশ ঘণ্টা রোজ, অথবা

সঠিকভাবে বললে সাড়ে দশ ঘণ্টা রোজের আইন প্রবর্তিত হয়েছে তার কথা জানেন। আমাদের দেখা বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কয়েকটি স্থানীয় শিল্পব্যবসার ক্ষেত্রে নয়, বরঞ্চ ইংল্যন্ড দুনিয়ার বাজারে যার জোরে কর্তৃত্ব করে শিল্পের সেই সব অগ্রগণ্য শাখাতেই এ হল এক আকস্মিক ও বাধ্যতামূলক মজুরি-বৃদ্ধি। এই মজুরি-বৃদ্ধি ঘটল একান্ত অসুবিধাজনক ব্যবস্থার মধ্যেই। ডঃ উর, অধ্যাপক সিনিয়র ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য সরকারী অর্থনৈতিক মুখপাত্রেরা **প্রমাণ করেছিলেন** — বলতেই হবে বন্ধু ওয়েস্টনের থেকে অনেক জোরাল যুক্তির জোরেই প্রমাণ করেছিলেন যে, এর ফলে ব্রিটিশ শিল্পের অন্তিম দশা উপস্থিত হবে। তাঁরা প্রমাণ করে দেন যে, এর অর্থ নিছক সাদাসিধে মজুরি-বৃদ্ধি নয় — বরং এর অর্থ হচ্ছে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ-হ্রাস দ্বারা সূচিত এবং তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত মজুরি-বৃদ্ধি। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, যে ১২শ ঘণ্টাটি আপনারা পুঁজিপতির কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছেন সেইটিই হল একমাত্র ঘণ্টা যার থেকে সে মুনাফা কামায়। সঞ্চয় হ্রাস, দাম বৃদ্ধি, বাজার হাতছাড়া, উৎপাদন সঙ্কোচন, সেইহেতু মজুরির উপরে এর প্রতিক্রিয়া এবং পরিণামে সর্বনাশের ভয় দেখান তাঁরা। বস্তুত, তাঁরা বলেই বসলেন যে, মাক্সিমিলিয়ান রবেস্পিয়েরের 'ঊর্ধ্বতম আইন' (২৭) তো এর তুলনায় তুচ্ছ ব্যাপার এবং এক হিসাবে তাঁরা ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল? দৈনিক খাটুনির ঘণ্টা কমে যাওয়া সত্ত্বেও কারখানার মজুরদের মাইনে বৃদ্ধি, কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রমাগত দর হ্রাস, তাদের শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ, পণ্যের জন্য বাজারের একটা অশ্রুতপূর্ব ক্রমবর্ধমান প্রসার। ১৮৬১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে 'বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির' সভায় আমি নিজে মিঃ **নিউম্যানকে** এ কথা স্বীকার করতে শুনেছি যে তিনি, ডাঃ উর, সিনিয়র ও অর্থনীতি বিজ্ঞানের অন্যান্য সরকারী প্রবক্তারা ভুল করেছিলেন আর জনসাধারণের সহজবুদ্ধিই ছিল নির্ভুল। অধ্যাপক ফ্রান্সিস নিউম্যান নন, মিঃ ডব্লিউ নিউম্যানের (২৮) উল্লেখই আমি করছি, কারণ মিঃ **টমাস টুকের** অপূর্ব গ্রন্থ -- যাতে ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত দামের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে -- সেই **'দামের ইতিহাস'এর** সম্পাদক ও অন্যতম লেখক হিসেবে তিনি অর্থনীতি বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি, স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন, শ্রমের উৎপাদন-শক্তির স্থির নির্দিষ্ট মাত্রা, পুঁজিপতিদের স্থির নির্দিষ্ট ও চিরন্তন ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদের বন্ধু ওয়েস্টনের স্থির নির্দিষ্ট ধারণা এবং তাঁর অন্যান্য সব স্থির নির্দিষ্টতা ও চরমকথা যদি ঠিক হয় তবে অধ্যাপক সিনিয়রের সখেদ আশঙ্কাই নির্ভুল হত, আর রবার্ট ওয়েন — ১৮১৫ সালেই যিনি দৈনিক খাটুনির সময় বেঁধে দেওয়াকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির (২৯) প্রথম পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সাধা সংস্কারের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সত্যসত্যই তাঁর নিউ ল্যানার্কের কাপ কলে নিজের দায়িত্বেই তার প্রবর্তনও করেছিলেন — তিনিই ভুল প্রতি হতেন।

দশ ঘণ্টা রোজ আইনের প্রবর্তন ও তার ফলে মজুরি-বৃদ্ধি যে সম ঘটে ঠিক সেই সময়েই গ্রেট ব্রিটেনে **কৃষি-মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি** পায় কী কারণে তা ঘটে এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

আপনারা যাতে বিভ্রান্ত না হন তার জন্য আমার আশু লক্ষ্যের থেকে প্রয়োজনীয় না হলেও কয়েকটি গোড়ার কথা বলে নিতে চাই।

কোনো লোক যদি সপ্তাহে দু-শিলিং মজুরি পায় আর তার মজ যদি বেড়ে চার শিলিং হয় তাহলে তার **মজুরির হার** শতকরা ১০০ বৃদ্ধি পায়। এটাকে **মজুরির হারে বৃদ্ধি** হিসাবে দেখলে একটা চমৎ ব্যাপার বলে মনে হবে, যদিও **মজুরির বাস্তব পরিমাণ** — সপ্তাহে শিলিং — তখনও একটা অতি শোচনীয় অনশনমাত্রার আয় হয়েই থাক কাজেই মজুরির **হারের** গালভরা শতকরা হিসাবে নিজেদের ভেসে দেবেন না। সব সময়েই প্রশ্ন তুলতে হবে — **মূল** পরিমাণটা কত

তাছাড়া এ কথাও বোঝা যায়, হপ্তায় ২ শিলিং করে পায় এমন দ ৫ শিলিং করে পায় এমন পাঁচজন ও ১১ শিলিং করে পায় এমন প লোক যদি থাকে, তবে কুড়িজন লোক মিলে সপ্তাহে পাবে ১০০ শিলি ৫ পাউন্ড। এখন ধরুন যদি এদের **মোট** সাপ্তাহিক মজুরির পরিমাণ শ ২০ ভাগ বেড়ে যায় তা হলে ৫ পাউন্ড বেড়ে দাঁড়াবে ৬ পাউন্ডে। গড় নিয়ে বলা যায় যে **মজুরির সাধারণ হার** শতকরা ২০ ভাগ বাড়ল, আসলে সেই দশজনের মজুরি একরকমই থেকে গেছে, পাঁচজন লে

একটা দলের মজুরি মাত্র ৫ শিলিং থেকে ৬ শিলিং বেড়েছে, আর পাঁচজনের অন্য দলের মজুরি ৫৫ শিলিং থেকে ৭০ শিলিং-এ উঠেছে। অর্ধেক লোকের অবস্থা এখানে কিছুমাত্র উন্নত হল না, এক-চতুর্থাংশের উন্নতি হল নগণ্য মাত্রায় আর বাকি এক-চতুর্থাংশের অবস্থা বাস্তবিকই উন্নত হয়ে উঠেছে। তবুও **গড়ের হিসাবে** ঐ কুড়িজন ব্যক্তির মোট মজুরির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ, আর যে-পুঁজি তাদের কাজে লাগাচ্ছে তার মোট পরিমাণের ও যে-পণ্য তারা তৈরি করছে তার দামের দিক থেকে ব্যাপারটা হবে ঠিক এমনই যেন তারা সবাই সমানভাবে গড়পড়তা মজুরি-বৃদ্ধির ভাগ পেয়েছে। কৃষি-মজুরদের ক্ষেত্রে মজুরির মান ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন জেলায় বহুলাংশেই বিভিন্ন রকমের হওয়ায় মজুরি-বৃদ্ধির ফল তারা পেয়েছে অত্যন্ত অসমভাবে।

সর্বশেষে, ঐ মজুরি-বৃদ্ধি যে-সময়ে ঘটে সেই সময়েই কতকগুলি বিরুদ্ধ প্রভাব কাজ করছিল -- যেমন রুশ যুদ্ধজনিত (৩০) নতুন ট্যাক্স, ব্যাপকভাবে কৃষি-মজুরদের বসত-কুটিরের ধ্বংসসাধন (৩১), ইত্যাদি।

এইটুকু মুখবন্ধ করে বলা যাক যে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে কৃষি-মজুরির গড়পড়তা হার **বেড়েছিল প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ।** আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে আমি আপনাদের কাছে প্রচুর খুঁটিনাটি তথ্য পেশ করতে পারতাম, কিন্তু বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি নীতিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণী প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট মনে হয়। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু **'কৃষিতে প্রযুক্ত শক্তিসমূহ',** লোকান্তরিত মিঃ **জন চ. মর্টন** ১৮৫৯ সালে লন্ডন আর্ট সোসাইটিতে (৩২) এটি পাঠ করেছিলেন। স্কটল্যান্ডের বারোটি ও ইংলন্ডের পঁয়ত্রিশটি কাউন্টির অধিবাসী প্রায় একশ জন কৃষকের কাছ থেকে তিনি যে-সব বিল ও অন্যান্য প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকেই মিঃ মর্টন তাঁর হিসাব খাড়া করেন।

বন্ধু ওয়েস্টনের মত অনুসারে, ও সেইসঙ্গে কারখানা-মজুরদের যে যুগপৎ মজুরি-বৃদ্ধি ঘটেছিল তার হিসাব এর সঙ্গে ধরলে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যেকার যুগে কৃষিজাত জিনিসপত্রের দাম প্রচন্ডভাবে বাড়া উচিত ছিল। কিন্তু আসলে ঘটেছিল কী? রুশ যুদ্ধ ও ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত পর পর ফসলের মন্দা সত্ত্বেও ইংলন্ডের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে

প্রধান ফসল গমের গড়পড়তা দর ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ এই পর্বের কোয়ার্টার পিছু প্রায় ৩ পাউন্ড থেকে ১৮৪৯-১৮৫৯ পর্বের কোয়ার্টার পিছু প্রায় ২ পাউন্ড ১০ শিলিং-এ নেমে গিয়েছিল। কৃষি-মজুরদের শতকরা ৪০ ভাগ মজুরি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ হল শতকরা ১৬ ভাগেরও বেশি গমের দর হ্রাস। ঐ সময়ের ভিতর যদি আমরা ঐ যুগের প্রথমদিকের সঙ্গে শেষদিকের, অর্থাৎ ১৮৪৯-এর সঙ্গে ১৮৫৯-এর যদি তুলনা করি তবে তার মধ্যে দেখা যায় যে, নিঃস্বদের সরকারী সংখ্যা ৯,৩৪,৪১৯ থেকে কমে গিয়েছিল ৮,৬০,৪৭০-এ — পার্থক্যটা ৭৩, ৯৪৯ জনের। আমি মানছি যে, এ হ্রাস খুবই কম এবং পরের বছরগুলিতে তা বজায়ও থাকে নি, কিন্তু তবু তা হ্রাস তো বটেই।

বলা যেতে পারে শস্য আইন (৩৩) বাতিল হবার ফলে ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ সাল এই পর্বের তুলনায় ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ এই পর্বে বিদেশী শস্য আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাতেই বা কী? নাগরিক ওয়েস্টনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক যে, বিদেশী বাজারে এই আকস্মিক, বিপুল ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা সেখানকার কৃষিজাত দ্রব্যের দরকে নিশ্চয়ই মারাত্মক রকম চড়িয়ে দেবে — বাইরে থেকেই হোক বা ভিতর থেকেই হোক বর্ধিত চাহিদার ফলাফল এক হবারই কথা। আসলে ঘটল কী? ফসল-মন্দার সামান্য কয়েকটি বছর ছাড়া এই গোটা যুগটাতেই শস্যের দরের সর্বনাশা পড়তি নিয়ে ফরাসী দেশে একটানা চেঁচামেচি চলে; মার্কিনদের বার বার করে পোড়াতে হল উদ্বৃত্ত উৎপন্ন; আর মিঃ আর্কার্টের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, রাশিয়াও তখন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের প্ররোচনা যোগায়, কারণ ইউরোপের বাজারে তার কৃষি-রপ্তানি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল মার্কিন প্রতিযোগিতার চাপে।

নাগরিক ওয়েস্টনের যুক্তির বিমূর্ত রূপটা দাঁড়ায় এই রকম: সর্বদাই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের ভিত্তিতেই প্রতিটি চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সুতরাং তার ফলে কখনও ঈপ্সিত দ্রব্যাদির যোগান বাড়তে পারে না, বাড়তে পারে শুধু তার মুদ্রা-দর। কিন্তু সবথেকে মামুলি পর্যবেক্ষণের ফলেও দেখা যায় যে, চাহিদা-বৃদ্ধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্যের বাজার-দরকে একেবারেই অপরিবর্তিত রাখে এবং অপরক্ষেত্রে বাজার-দর সাময়িকভাবে চড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে যোগান বাড়বে এবং তারপরে দর আগের পর্যায়ে

ও অনেক সময় আগের পর্যায়েরও নিচে নেমে যাবে। বাড়তি মজুরি বা অন্য যে কোনো কারণের জন্যই চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটুক না কেন, তাতে মোটেই সমস্যার অবস্থান্তর ঘটে না। নাগরিক ওয়েস্টনের মত অনুসরণ করতে গেলে মজুরি বৃদ্ধির অনন্যসাধারণ অবস্থার ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলির ব্যাখ্যা যত কঠিন হয়, এই সাধারণ অবস্থার ঘটনাবলির ব্যাখ্যাও তেমনি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সে সম্পর্কে তাঁর যুক্তির কোনও বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা নেই। যে নিয়মগুলির ফলে চাহিদা-বৃদ্ধির দরুন শেষ পর্যন্ত বাজার-দর না চড়ে বরং যোগানই বৃদ্ধি পায়, সে নিয়মগুলির হেতু নির্ণয়ে তাঁর হতবুদ্ধিতাই শুধু এতে প্রকাশ পাচ্ছে।

৩। মজুরি ও কারেন্সি

বিতর্কের দ্বিতীয় দিনে আমাদের বন্ধু ওয়েস্টন তাঁর পুরনো বক্তব্যগুলি নতুন ছাঁদে সাজালেন। তিনি বললেন: আর্থিক মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেলে তার ফলে সেই মজুরি দিতে বেশি মুদ্রা লাগবে। যেহেতু মুদ্রার পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট, সুতরাং সেই স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার সাহায্যে কী করে আপনারা বর্ধিত আর্থিক মজুরি দিতে পারবেন? প্রথমে আর্থিক মজুরি-বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মজুরের বরাদ্দ পণ্যের পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট বলে বিপত্তি ঘটল; এখন মুশকিল বাধছে পণ্যের পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট হলেও আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে। অবশ্য তাঁর গোড়ার আপ্তবাক্যটা যদি আপনারা বাতিল করেন তাহলে তাঁর পরবর্তী নালিশও দূর হয়ে যায়।

যা হোক, আমি দেখাব যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই কারেন্সি সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই।

আপনাদের দেশে আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা ইউরোপের যে কোনো দেশের চাইতে অনেক বেশি উন্নত। ব্যাঙ্কব্যবস্থার পরিধি ও কেন্দ্রীকরণের কল্যাণে একই পরিমাণ মূল্যের সঞ্চালনে এবং একই, এমন কি অধিক পরিমাণ ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য অনেক কম কারেন্সির প্রয়োজন হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মজুরির দিক থেকে দেখলে ইংরেজ কারখানা-মজুর প্রতি সপ্তাহে দোকানদারকে তার মজুরি-লব্ধ অর্থ তুলে দেয়, দোকানদার আবার প্রতি সপ্তাহে সেই অর্থ ব্যাঙ্কমালিককে জমা দেয়। ব্যাঙ্ক আবার প্রতি সপ্তাহে শিল্পপতিকে সে অর্থ ফেরত দেয়। সে আবার সেই অর্থ মজুরদের দেয় ইত্যাদি। এই কৌশলের ফলে একজন মজুরের গোটা বছরের মজুরিই, ধরুন ৫২ পাউন্ড, কেবল একটিমাত্র পাউন্ড মুদ্রার সাহায্যে দেওয়া চলে, যা প্রতি সপ্তাহে এই চক্রে ঘুরে আসে। এমন কি ইংলন্ডেও এ ব্যবস্থা স্কটল্যান্ডের মতো উন্নত নয় এবং সর্বত্র সমান উন্নতও নয়; কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, নিছক শিল্পপ্রধান অঞ্চলের তুলনায় কোনো কোনো কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অনেক কম পরিমাণ মূল্য চলাচলের জন্য অনেক বেশি কারেন্সির প্রয়োজন হয়।

আপনারা যদি ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে যান তবে দেখবেন **আর্থিক মজুরি** সেখানে ইংলন্ডের থেকে অনেক কম, কিন্তু জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সে তা সঞ্চালিত হয় **অনেক বেশি পরিমাণ কারেন্সির** সাহায্যে। স্বর্ণ মুদ্রাটি সেখানে অত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের হাতে পড়বে না বা শিল্পপুঁজিপতির কাছে ফেরত যাবে না; আর তাই একটি স্বর্ণ মুদ্রার মাধ্যমে বছরে ৫২ পাউন্ড সঞ্চালন করানোর জায়গায় হয়তো ২৫ পাউন্ডের মতন মজুরি সঞ্চালন করাতেই তিনটি স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হবে। সুতরাং ইউরোপীয় ভূখন্ডের দেশগুলির সঙ্গে ইংলন্ডের তুলনা করলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবেন যে, বেশি আর্থিক মজুরির চাইতে হয়তো কম আর্থিক মজুরি সঞ্চালন করাতেই অনেক বেশি কারেন্সির প্রয়োজন হতে পারে। এটা হচ্ছে আসলে আমাদের বর্তমান আলোচনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত একটা টেকনিকাল ব্যাপারমাত্র।

সবথেকে ভাল হিসাব যা আমার জানা আছে সে অনুসারে এই দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বাৎসরিক আয় ২৫ কোটি পাউন্ড বলে ধরা যেতে পারে। এই বিপুল অঙ্কটির সঞ্চালনে লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউন্ড। ধরুন শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি বেড়ে গেল। তা হলে ৩০ লক্ষ পাউন্ডের জায়গায় ৪৫ লক্ষ পাউন্ড লাগবে। মজুরদের দৈনিক খরচের মস্ত বড় একটা অংশ রুপো ও তামায় অর্থাৎ সোনার সঙ্গে যার আপেক্ষিক মূল্য অভাঙ্গা কাগজে মুদ্রার

মতো আইনের দ্বারা মনগড়াভাবে নির্ধারিত হয় এমন প্রতীক-মুদ্রাতেই চলে। এইজন্য আর্থিক মজুরি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়লে বেশি করে ধরলেও দশ লক্ষ পাউন্ড পরিমাণ অতিরিক্ত স্বর্ণ মুদ্রার চলাচলই যথেষ্ট হবে। ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড বা বেসরকারী ব্যাঙ্কের ভান্ডারে বর্তমানে যে দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণপিন্ড বা মুদ্রা নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে আছে, তাই তখন সঞ্চালন করতে থাকবে। প্রয়োজনীয় বাড়তি কারেন্সির অভাবের দরুন কোনো অসুবিধা উপস্থিত হলে ঐ দশ লক্ষের বাড়তি মুদ্রণ বা ব্যবহারজনিত বাড়তি ক্ষয়ক্ষতির সামান্য খরচটুকুও এড়ানো যেতে পারে এবং এড়ানোই হবে। আপনারা সবাই জানেন যে, এ দেশের কারেন্সি দুটো মস্ত ভাগে বিভক্ত। একটা ভাগ হল বিভিন্ন মূল্যের ব্যাঙ্ক-নোট — ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়ী লেনদেনের জন্য এবং ভোক্তাদের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের মোটা রকমের মূল্য দেবার সময়ে এর ব্যবহার হয়। আর এক ধরনের কারেন্সি — ধাতব মুদ্রা চলে খুচরো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে। স্বতন্ত্র হলেও এই দুই ধরনের কারেন্সি পরস্পরের ক্ষেত্রেও কাজ চালায়। তাই এমনকি মোটা রকমের পাওনা মেটাবার সময়েও ৫ পাউন্ডের কম খুচরো অঙ্কের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বর্ণমুদ্রা চলে। ধরুন যদি আগামীকাল ৪ পাউন্ড, ৩ পাউন্ড বা ২ পাউন্ডের নোট চালু হয় তাহলে এই সব চলাচলের খাতে যে সোনা চলছে তা তখনই সেখান থেকে হঠে গিয়ে চলে যাবে সেইসব খাতে যেখানে আর্থিক মজুরি বাড়ার ফলে তা প্রয়োজন। এইভাবে শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি-বৃদ্ধির দরুন যে বাড়তি দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন — একটি স্বর্ণমুদ্রা না বাড়িয়েও তার যোগান দেওয়া সম্ভব হতে পারে। আবার একটি মাত্র বাড়তি ব্যাঙ্ক-নোট ছাড়াও ঐ এক ফলই পাওয়া যেতে পারে বাড়তি হুন্ডি চলাচল মারফত — যেমন বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল ল্যাঙ্কাশায়ারে।

নাগরিক ওয়েস্টন কৃষি-মজুরদের মজুরির ক্ষেত্রে যেমন ধরেছেন, মজুরির হার ঐ রকম শতকরা একশ ভাগ বৃদ্ধি পেলে আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম যদি বিপুল পরিমাণে বাড়ে এবং তাঁর কথা মতো এমন বাড়তি টাকার দরকার পড়ে যা যোগানো অসম্ভব, তা হলে **সাধারণভাবে মজুরি কমে গেলে** বিপরীত দিকেও নিশ্চয়ই একই ফল একই মাত্রায় দেখা যাবে। বেশ! আপনারা সবাই জানেন যে, ১৮৫৮-১৮৬০ এই কটা বছর তুলাশিল্পের পক্ষে সবচেয়ে

শ্রীবৃদ্ধির বছর ছিল আর সেইদিক থেকে আশ্চর্যরকম ভাবেই ১৮৬০ সালটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে অতুলনীয় হয়ে রয়েছে, আবার সেই সঙ্গে শিল্পের অন্য সব শাখাগুলিতেও সে বছরে সমৃদ্ধতম অবস্থা ছিল। তুলাশিল্পের মজুরদের ও সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত শিল্পের মজুরদের মজুরি ১৮৬০ সালে আগের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তারপর এল আমেরিকার সঙ্কট এবং ঐ মোট মজুরি হঠাৎ আগেকার পরিমাণের প্রায় এক-চতুর্থাংশে নেমে গেল। বিপরীত দিকে হলে এটা হত শতকরা ৩০০ ভাগ মজুরিবৃদ্ধি। মজুরি পাঁচ থেকে বেড়ে কুড়ি হলে আমরা বলি যে, শতকরা ৩০০ ভাগ বেড়েছে; যদি কুড়ি থেকে কমে তা পাঁচে দাঁড়ায় আমরা বলি শতকরা ৭৫ ভাগ কমেছে, অথচ বাড়তির ক্ষেত্রেই হোক অথবা কমতির ক্ষেত্রেই হোক, মজুরি বাড়া-কমার পরিমাণ ঠিক একই অর্থাৎ পনেরো শিলিংই থাকছে। তাই তখন এসেছিল মজুরি-হারের এক অভূতপূর্ব ও আকস্মিক পরিবর্তন। তুলাব্যবসায়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত শুধু তারাই নয়, তার উপরে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল সমস্ত মজুরের হিসাব যদি আমরা রাখি তাহলে দেখি যে, সে পরিবর্তনের আওতার মধ্যে যত মজুর পড়েছে তাদের সংখ্যা কৃষি-মজুরদের সংখ্যার দেড়গুণ। কিন্তু গমের দাম কি তখন কমেছিল? ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সাল এই তিন বছরে ঐ দাম কোয়ার্টার পিছু বাৎসরিক গড়পড়তা ৪৭ শিলিং ৮ পেন্স থেকে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ এই তিন বছরে কোয়ার্টার পিছু বাৎসরিক গড়পড়তা ৫৫ শিলিং ১০ পেন্সে বেড়ে উঠল। আর কারেন্সির ব্যাপারে, ১৮৬০ সালে যেখানে ৩৩,৭৮,১০২ পাউন্ড মুদ্রা টাঁকশালে মুদ্রিত হয়েছিল সেখানে ১৮৬১ সালে ৮৬,৭৩,২৩২ পাউন্ড মুদ্রা মুদ্রিত হল। অর্থাৎ ১৮৬০ সালের থেকে ১৮৬১ সালে ৫২,৯৫,১৩০ পাউন্ড মুদ্রা বেশি মুদ্রিত হয়। এ কথা ঠিক যে, ১৮৬০ সালের চেয়ে ১৮৬১ সালে ব্যাঙ্ক-নোট চালু থাকে ১৩,১৯,০০০ পাউন্ড কম। সেটা বাদ দিন। তা হলেও ১৮৬০ সালের সমৃদ্ধ বছর থেকে ১৮৬১ সালের ৩৯,৭৬,১৩০ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪০,০০,০০০ পাউন্ড বেশি মুদ্রা থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গেই ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের স্বর্ণপিন্ডের মজুদ ঠিক ততটাই না হলেও প্রায় সমানুপাতে কমে যায়।

১৮৪২-এর সঙ্গে ১৮৬২ সালের তুলনা করুন। চালু পণ্যের মূল্য ও পরিমাণের প্রচণ্ড বৃদ্ধি ছাড়াও ১৮৬২ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের রেলওয়ের শেয়ার, ঋণ ইত্যাদিতে নিয়মিত লেনদেনের বাবদই শুধু পুঁজি ব্যয়িত হয় ৩২,০০,০০,০০০ পাউণ্ড; ১৮৪২ সালে এ সংখ্যা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য বলে বোধ হত। তবু মোট চালু মুদ্রার পরিমাণ ১৮৬২ ও ১৮৪২ সালে প্রায় সমানই ছিল, এবং শুধু পণ্যই নয়, মোটামুটি সমস্ত রকম আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই মূল্যের প্রচণ্ড ক্রমবর্ধমানতা সত্ত্বেও সাধারণভাবে আপনারা কারেন্সির ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণই দেখতে পাবেন। বন্ধু ওয়েস্টনের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এ ধাঁধার সমাধান নেই।

ব্যাপারটাকে আর একটু তলিয়ে দেখলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, মজুরির কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও, তাকে স্থির বলে ধরে নিলেও সঞ্চালনীয় পণ্যের মূল্য ও পরিমাণ এবং সাধারণভাবে যে পরিমাণ আর্থিক লেনদেন মেটানো হয়, তার পরিমাণ প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়; যে ব্যাঙ্ক-নোট ছাড়া হয় তার পরিমাণ প্রতিদিন বদলায়; মুদ্রার মাধ্যম বিনাই বিল, চেক, খাতাপত্রে ঋণ, ক্লিয়ারিং হাউস মারফত যে পরিমাণ প্রাপ্য মেটানো হয় প্রতিদিনই তার পরিবর্তন হচ্ছে; নগদ ধাতব কারেন্সির যতটা দরকার পড়ে সেক্ষেত্রেও, যে মুদ্রা চালু রয়েছে এবং যে মুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড মজুদ রয়েছে কিংবা ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে নিষ্ক্রিয় রয়েছে তার অনুপাত প্রতিদিন বদলায়; দেশের আভ্যন্তরিক লেনদেনের জন্য যে পরিমাণ স্বর্ণ লাগে এবং আন্তর্জাতিক সঞ্চালনের জন্য বাইরে যে পরিমাণ স্বর্ণ চালান হয় তার অনুপাতও রোজই বদলে যাচ্ছে। তিনি দেখতে পেতেন যে কারেন্সির স্থিরতা সম্পর্কে তাঁর অন্ধ বিশ্বাসটি একটা মস্ত ভুল, দৈনন্দিন ঘটনাগতির সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতিই নেই। কারেন্সির নিয়ম সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাকে মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হিসেবে খাড়া না করে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে কোন্ কোন্ নিয়মের বলে কারেন্সি নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় বরং সেই সম্পর্কেই তিনি অনুসন্ধান করতে পারতেন।

৪। যোগান ও চাহিদা

আমাদের বন্ধু ওয়েস্টন 'repetitio est mater studiorum' (পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বিদ্যাভ্যাসের জননী) এই ল্যাটিন প্রবাদ মানেন। তাই তিনি আবার তাঁর গোড়াকার আপ্তবাক্যটির পুনরাবৃত্তি করছেন এই নতুন রূপে যে, মজুরি-বৃদ্ধিজনিত কারেন্সি সংকোচের ফলে পুঁজি কমে যাবে, ইত্যাদি। কারেন্সি সম্পর্কে তাঁর উদ্ভট ধারণা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি; তাই কারেন্সি সম্পর্কিত তাঁর কাল্পনিক দুর্বিপাক থেকে যেসব কাল্পনিক ফলাফল উৎসারিত হবে বলে তিনি আন্দাজ করেছেন সে নিয়ে আলোচনা আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় তাঁর যে **একটিমাত্র অভিন্ন আপ্তবাক্যের** বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, আমি আর কালক্ষেপ না করে **সেটির সহজতম তাত্ত্বিক রূপটি** দেখাব।

একটিমাত্র মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে কী রকম বিচারবিমুখ মনোভাব নিয়ে তিনি বিষয়টিতে হাত দিয়েছেন। তিনি ওকালতি করেছেন মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, অথবা সেই বৃদ্ধিজনিত উচ্চ মজুরির বিরুদ্ধে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি — বেশি মজুরি আর কম মজুরি বলতে তিনি কী বোঝেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, সপ্তাহে পাঁচ শিলিং মজুরি কেন কম ও বিশ শিলিং মজুরিই বা বেশি কেন? বিশের তুলনায় পাঁচ যদি কম হয় তবে দু'শর তুলনায় বিশ তো আরো কম। তাপমান যন্ত্রের সম্পর্কে যদি কাউকে বক্তৃতা করতে হয় আর যদি তিনি বেশি ও কম তাপমাত্রা নিয়ে গলাবাজি শুরু করেন তবে কোনও জ্ঞানই তিনি বিতরণ করবেন না। তাঁকে গোড়াতেই বলতে হবে, কী করে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বার করতে হয় আর কীভাবে তাপমান যন্ত্রের বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারকের খামখেয়ালির দ্বারা নয়, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই ঐ প্রমাণ-মাত্রাগুলি নির্দিষ্ট। মজুরি ও মুনাফার ব্যাপারে নাগরিক ওয়েস্টন যে শুধু অর্থনৈতিক নিয়ম থেকে ঐ ধরনের প্রমাণ-মাত্রা বার করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। কম ও বেশি — বাজার-চলতি এই বুলিটার নির্দিষ্ট অর্থ আছে এই কথা মেনে নিয়েই তিনি খুশী, যদিও এ কথা

স্বতঃসিদ্ধ যে মজুরি মাপবার মতো একটা প্রমাণ-মাত্রার সঙ্গে তুলনা করেই বলা চলে মজুরি বেশি কি কম।

তিনি আমায় বলতে পারবেন না কেন বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। যদি তিনি জবাব দেন — যোগান ও চাহিদার নিয়ম দ্বারাই এটা নির্দিষ্ট হয়েছে, তাহলে আমি তাঁকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব, যোগান ও চাহিদা নিজেরাই বা কোন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়? সে জবাব তখন তাঁকেই ফেলবে বেকায়দায়। শ্রমের যোগান ও চাহিদার মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় ও তারই সঙ্গে বদলায় শ্রমের বাজার দর। চাহিদা যদি যোগানকে ছাপিয়ে যায় তাহলে মজুরি বাড়ে; যোগান যদি চাহিদাকে ছাপায় তবে মজুরি কমে, যদিও সে পরিস্থিতিতে যোগান ও চাহিদার সত্যকার অবস্থা **যাচাই করার** জন্য, ধরুন, ধর্মঘট বা অন্য কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যোগান ও চাহিদাকেই যদি আপনি মজুরি-নিয়ামক নিয়ম বলে মেনে নেন তাহলে মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গলাবাজি করা যেমন ছেলেমানুষি তেমনই নিরর্থক হবে, কারণ যে পরম নিয়মের আপনি দোহাই পাড়ছেন সেই নিয়ম অনুসারেই কিছুদিন অন্তর অন্তর মজুরি হ্রাসের মতোই কিছুদিন পরে পরে মজুরি-বৃদ্ধিও সমান আবশ্যিক ও সঙ্গত। যোগান ও চাহিদাকে যদি আপনি মজুরি-নিয়ামক নিয়ম বলে না মানেন তাহলে আমি আবার প্রশ্ন তুলব — কেন বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়?

কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে বিবেচনা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই: শ্রম বা অন্য কোনো পণ্যের মূল্য শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় যোগান ও চাহিদার দ্বারা — একথা ভাবলে আপনারা সম্পূর্ণ ভুল করবেন। বাজার-দরের সাময়িক **উঠতি-পড়তিটুকু** ছাড়া যোগান ও চাহিদা আর কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে না। কোনো পণ্যের বাজার-দর কেন তার **মূল্যের** ওপরে ওঠে বা নিচে নামে যোগান ও চাহিদা তার কারণ আপনাদের বোঝাতে পারবে, কিন্তু সেই খাস **মূল্যটা** সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা তারা দিতে পারবে না। ধরুন, যোগান ও চাহিদা সমান সমান হল, অথবা অর্থতাত্ত্বিকেরা যা বলেন, সাম্যাবস্থায় উপনীত হল। এই বিপরীত শক্তিদুটি সমান সমান হওয়া মাত্রই তো তারা পরস্পরকে অকেজো করে ফেলবে, এদিক বা ওদিক কোনো দিকেই তারা তখন কাজ করতে

পারবে না। যে মুহূর্তে যোগান ও চাহিদা পরস্পর **সমান সমান** হয় এবং তার ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখনই পণ্যের **বাজার-দর** তার **আসল মূল্যের সঙ্গে,** যাকে ঘিরে পণ্যের বাজার-দর ওঠানামা করে সেই নির্দিষ্টমান দামের সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং, ঐ **মূল্যের** প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে হলে বাজার-দরের ওপর যোগান ও চাহিদার সাময়িক প্রভাবের কোনো কথা আসে না। মজুরি ও অন্য সমস্ত পণ্যের দামের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৫। মজুরি ও দাম

সহজতম তত্ত্বগতরূপে পর্যবসিত করলে আমাদের বন্ধুর সমস্ত যুক্তিগুলি এই একটিমাত্র আপ্তবাক্যে দাঁড়ায়: **'পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় মজুরির দ্বারা।'**

এই অচল ও ভ্রান্তপ্রমাণিত যুক্তিবিভ্রমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে আমি বাস্তব পর্যবেক্ষণের আবেদন জানাতে পারতাম। আপনাদের বলতে পারতাম যে, ইংরেজ কারখানা-মজুর, খনি-শ্রমিক, জাহাজী-মজুর প্রভৃতি যাদের শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত উঁচু — সস্তা উৎপন্নের দরুন সব জাতির থেকে কম দামে তাদের মাল বিকোয়। অথচ ধরুন ইংরেজ কৃষি-মজুর, যার শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত কম, তার উৎপন্ন সামগ্রীর উঁচু দামের ফলে প্রায় সবদেশই পণ্য বিক্রয় করে তার থেকে কম দামে। একই দেশের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশের পণ্যের মধ্যে তুলনা টেনে দেখাতে পারতাম যে, কিছু ব্যতিক্রম — যতটা বাহ্যিক ততটা আসলে নয় — বাদ দিলে গড়পড়তায় উঁচু দামের শ্রম উৎপাদন করে সস্তা দামের পণ্য এবং সস্তা দামের শ্রম উৎপাদন করে উঁচু দামের পণ্য। অবশ্য এর থেকে প্রমাণ হবে না যে, একক্ষেত্রে শ্রমের উঁচু দাম ও অন্যক্ষেত্রে তার সস্তা দামই যথাক্রমে ঐ ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফলের কারণ। তবু এর থেকে অন্তত এটা প্রমাণ হয় যে, পণ্যের দাম শ্রমের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। অবশ্য এই ধরনের হাতুড়ে পদ্ধতি প্রয়োগ আমাদের পক্ষে একেবারেই বাহুল্য।

'পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় মজুরির দ্বারা' — বন্ধুবর ওয়েস্টন এই আপ্তবাক্যের অবতারণা করেছেন বললে তা হয়ত অস্বীকার

করা হবে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি কখনও একে সূত্রাকারে উপস্থিত করেন নি। বরঞ্চ তিনি এ কথাই বলেছেন যে. পণ্যের দামের মধ্যে মুনাফা ও খাজনারও অংশ রয়েছে, কারণ পণ্যের দাম থেকে শুধু মজুরের মজুরি নয়, পুঁজিপতির মুনাফা ও ভূস্বামীর খাজনাও দিতে হয়। তাহলে তাঁর ধারণা অনুসারে দাম গঠিত হয় কী ভাবে? প্রথমত, মজুরি দিয়ে। তারপরে তার সঙ্গে বাড়তি একটি শতকরা অংশ যোগ করা হয় পুঁজিপতি বাবদ এবং আর একটি অংশ ভূস্বামী বাবদ। ধরুন কোনো পণ্য-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের মজুরি হচ্ছে দশ। মুনাফা-হার যদি শতকরা ১০০ ভাগ হয় তবে যে মজুরি আগাম দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পুঁজিপতি যোগ দেবে দশ, আর খাজনা-হারও মজুরির শতকরা ১০০ ভাগ হলে এর সঙ্গে যোগ হবে আরো দশ। তাহলে পণ্যের মোট দাম দাঁড়াবে ত্রিশ। কিন্তু এভাবে দাম নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে নিতান্ত মজুরি দ্বারাই দাম নির্ধারণ। এ ক্ষেত্রে যদি মজুরি বেড়ে বিশে দাঁড়ায় তাহলে পণ্যের দাম হবে ষাট ইত্যাদি। তদনুসারে অর্থশাস্ত্রের যেসব সেকেলে লেখকেরা মজুরিই দাম নিয়ন্ত্রণ করে এই আপ্তবাক্যের পত্তন করেছিলেন, তাঁরা এ সূত্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুনাফা ও খাজনাকে **মজুরির উপর বাড়তি কিছু শতকরা অংশ হিসেবে** দেখিয়ে। অবশ্য তাঁদের কেউই ঐ শতকরা অংশের মাত্রাকে কোনো অর্থনৈতিক নিয়মের মধ্যে ফেলতে পারেন নি। বরঞ্চ মনে হয় যেন তাঁরা ভাবেন ঐতিহ্য, প্রচলিত প্রথা, পুঁজিপতির ইচ্ছা বা এই ধরনের যথেচ্ছ ও ব্যাখ্যাতীত কোনো পদ্ধতিতেই মুনাফা নির্ধারিত হয়। যদি তাঁরা বলেন যে, মুনাফা নির্দিষ্ট হয় পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে, তাহলেও কিছুই বলা হবে না। সেই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যবসায়ের ভিন্ন ভিন্ন মুনাফার হারকে নিশ্চয়ই সমান করতে থাকে, অথবা বিভিন্ন হারকে একটা গড়পড়তা মাত্রায় এনে ফেলে, কিন্তু মাত্রাটিকে অথবা সাধারণ মুনাফা-হারকে তা কখনই নির্ধারিত করতে পারে না।

পণ্যের দাম মজুরির দ্বারা নির্ধারিত হয় এ কথা বলতে কী বোঝায়? শ্রমের দামের নামই যেহেতু মজুরি, তাই বোঝায় যে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমের দাম দিয়ে। যেহেতু '**দাম**' হচ্ছে বিনিময়-মূল্য -- এবং মূল্য বলতে আমি সর্বদা বিনিময়-মূল্যই বুঝিয়েছি -- **মুদ্রার অঙ্কে ব্যক্ত** বিনিময়-মূল্য, তাই বক্তব্যটি দাঁড়ায় এই রকম যে, '**পণ্যের মূল্য** নির্ধারিত হয়

শ্রমের মূল্য দিয়ে'। অথবা **'শ্রমের মূল্যই হল মূল্যের সাধারণ পরিমাপ'**।

কিন্তু **'শ্রমের মূল্যটা'** তাহলে স্থির হয় কী ভাবে? এইখানেই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য থমকাতে হয় যদি যুক্তিসম্মতভাবে আমরা চিন্তা করতে চাই। এ মতবাদের প্রবক্তারা অবশ্য যুক্তিগত নীতিনিষ্ঠার পরোয়া করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বন্ধু ওয়েস্টনকেই ধরুন। গোড়ায় তিনি আমাদের বললেন যে, মজুরিই পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে আর কাজেই মজুরি বাড়ালে দামও বাড়তে বাধ্য। তারপর তিনি উল্টো গেয়ে আমাদের দেখালেন যে, মজুরি বাড়লে কিছু লাভ নেই, কারণ পণ্যের দাম বেড়ে যাবে এবং কারণ, যেসব পণ্যের পেছনে মজুরি খরচ করা হয় তাদের দাম দিয়েই আসলে তা মাপা হয়। অর্থাৎ এই বলে শুরু করা হল যে, শ্রমের মূল্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে, আর শেষ করা হল এই বলে যে, পণ্যের মূল্য শ্রমের মূল্য স্থির করে। এইভাবে এক অতি জটিল কুম্ভীপাকের মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাব, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছব না।

মোটের উপর এটা স্পষ্ট যে, কোনো একটা পণ্যের মূল্যকে যেমন ধরুন শ্রম, শস্য, বা অন্য কোনো পণ্যের মূল্যকে, মূল্যের সাধারণ পরিমাপ ও নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করলে সংকট ঠেলে রাখা হয় মাত্র, কারণ একটি মূল্য যার নিজেরই পরিমাপ প্রয়োজন তাকে দিয়েই আমরা স্থির করেছি আর একটি মূল্য।

'মজুরি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে' — এই আপ্তবাক্যকে সব থেকে অমূর্তভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় এই যে, 'মূল্য নির্ধারিত হয় মূল্যের দ্বারাই' এবং এই পুনরাবৃত্তির অর্থ এই যে, আসলে মূল্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলে অর্থশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কিত সমস্ত যুক্তিতর্ক শুধু বাচালতাতেই পর্যবসিত হয়। তাই রিকার্ডোর মস্ত কীর্তি হল এই যে, তিনি ১৮১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর **'অর্থশাস্ত্রের নীতিসমষ্টি'** গ্রন্থে 'মজুরি দাম নির্ধারণ করে' এই সাবেকী অতি প্রচলিত, জরাজীর্ণ যুক্তিবিভ্রম সমূলে খণ্ডন করেন — সেই যুক্তিভ্রম যা অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর ফরাসী পূর্বগামীরা তাঁদের গবেষণার সত্যকার বৈজ্ঞানিক অংশে বর্জন করলেও জন-প্রচারিত স্থূল অধ্যায়গুলিতে আবার তা পুনরুদ্ধৃত করেছিলেন।

৬। মূল্য ও শ্রম

নাগরিকগণ, আমি এখন এমন জায়গায় এসে পেঁছেছি যেখানে আমাকে প্রশ্নটির সত্যকার পরিব্যাখ্যানের মধ্যে যেতে হবে। খুব সন্তোষজনক ভাবে এ কাজ করার প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না, কারণ তা করতে হলে আমাকে অর্থশাস্ত্রের সমগ্র এলাকা ধরে টান দিতে হবে। ফরাসীরা যাকে বলে মাত্র 'effleurer la question' আমি তেমনি শুধু মূল কথাগুলি ছুঁয়ে যেতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন তুলতে হবে: পণ্যের **মূল্য** কী? কী ভাবে তা নির্ধারিত হয়?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পণ্যের মূল্য জিনিষটা বুঝি একেবারেই **আপেক্ষিক**; একটি পণ্যকে অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে না দেখলে বুঝি মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। বাস্তবিকই, মূল্য বলতে, অর্থাৎ কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য বলতে আমরা অন্য সব পণ্যের সঙ্গে আনুপাতিক পরিমাণে তার যে লেনদেন হয় তা-ই বুঝে থাকি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে: পণ্যসমূহের ভিতর পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাতটাই বা নির্ধারিত হয় কী ভাবে?

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, এই অনুপাতগুলি অসংখ্য ধরনের হতে পারে। কোনো একটি পণ্যকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ গমকে ধরলে আমরা দেখব যে, বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে প্রায় অসংখ্য রকমের নানা অনুপাতে এক কোয়ার্টার গমের বিনিময় হতে পারে। তবু **তার মূল্য বরাবরই একই থাকায়** রেশম, সোনা বা অন্য যে-কোনো পণ্যের মাধ্যমেই তা প্রকাশ পাক না কেন, বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে **বিনিময়ের বিভিন্ন হার** থেকে তাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটা সত্তা হতেই হবে। বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে এই বিভিন্ন সমীকরণগুলিকে একেবারেই অন্যরূপে প্রকাশ করা অবশ্য সম্ভব।

তাছাড়া আমি যদি বলি এক কোয়ার্টার গমকে এক বিশেষ অনুপাতে লোহার সঙ্গে বিনিময় করা যায়, বা এক কোয়ার্টার গমের মূল্য এক বিশেষ পরিমাণ লোহার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহলে আমি এ কথাই বলি যে, গমের মূল্য ও লোহার ক্ষেত্রে তার তুল্যমূল্য হচ্ছে **তৃতীয় একটি জিনিসের** সমান যা গমও নয় লোহাও নয়, কারণ আমি ধরে নিয়েছি যে দুই বিভিন্ন রূপে

ওরা একটা পরিমাণকেই প্রকাশ করছে। কাজেই দুয়ের মধ্যে যে-কোনোটিকে, তা সে গমই হোক আর লোহাই হোক, অপরটির ওপর নির্ভর না করেই তৃতীয় একটি জিনিসে পরিণত করা যেতে পারে, যে তৃতীয় জিনিসটি হল তাদের উভয়েরই সাধারণ পরিমাপ।

এই ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করার জন্য আমি খুবই সহজ একটি জ্যামিতিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। সবরকম সম্ভাব্য রূপ ও আয়তনের ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল তুলনা করার সময়, অথবা চতুষ্কোণ বা অন্য যে কোনো ঋজুরেখ ক্ষেত্রের সঙ্গে ত্রিকোণের ক্ষেত্রফল তুলনা করার সময়ে আমরা কী করি? আমরা যে কোনো ত্রিকোণের ক্ষেত্রফলকে পরিণত করি এমন একটা আকারে যা তার দৃশ্য-রূপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ত্রিকোণের ক্ষেত্রফল তার ভূমি ও উচ্চতার গুণফলের অর্ধেক — ত্রিকোণের চরিত্র থেকে একথা জেনে আমরা এবার নানারকম ত্রিকোণের এবং যে কোনো ঋজুরেখ ক্ষেত্রের নানা মূল্য তুলনা করতে পারি, কারণ সমস্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্রকেই কতকগুলি ত্রিকোণে ভাগ করা সম্ভব।

বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের বেলায়ও ঐ একই ধরনের পদ্ধতি থাকা উচিত। সমস্ত পণ্যকেই পরিণত করতে পারা চাই এমন একটা অভিব্যক্তিতে যা তাদের সকলকার পক্ষেই সাধারণ এবং এই একই পরিমাপটা যে বিভিন্ন অনুপাতে তাদের মধ্যে বর্তমান তাই দিয়েই তাদের পার্থক্য।

যেহেতু পণ্যের **বিনিময়-মূল্য** ঐসব দ্রব্যের নিছক **সামাজিক ক্রিয়া**, তাদের **স্বাভাবিক** গুণাগুণের সঙ্গে এ বিনিময়-মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেহেতু গোড়াতেই আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে: সমস্ত পণ্যের ভিতরকার সাধারণ **সামাজিক সারবস্তু** কী? সে হচ্ছে **শ্রম**। কোনো পণ্য উৎপাদন করতে গেলে তার উপর কিছু পরিমাণ শ্রম লাগাতে হবে, তার মধ্যে কিছু শ্রম রূপায়িত করতেই হবে। এখানে আমি শুধু **শ্রমই** নয়, **সামাজিক** শ্রমের কথাই বলছি। যদি কেউ তার নিজের আশু ব্যবহারের জন্য এবং নিজেই তা ভোগ করার জন্য কোনো সামগ্রী উৎপাদন করে তাহলে সে যা সৃষ্টি করল তা হল **উৎপন্ন দ্রব্য**, কিন্তু **পণ্য** নয়। একজন আত্মপোষক উৎপাদনকারী হিসেবে সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটি **পণ্য** উৎপাদন করতে গেলে মানুষকে শুধু **সামাজিক** চাহিদা মেটাবার মতো কোনো সামগ্রী উৎপাদন

করলেই চলবে না, তার নিজের শ্রমকেও **সমাজ** যে **শ্রম** ব্যয় করে তার সমগ্র পরিমাণের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হতে হবে। এ **শ্রমকে সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রমবিভাগের** অধীন হতে হবে। অন্যান্য শ্রমবিভাগ না থাকলে সে শ্রম কিছুই নয়, এবং তার কাজও আবার ঐ শ্রমবিভাগকে **সুসম্পূর্ণ** করা।

পণ্যকে যদি আমরা **মূল্য হিসেবে** বিবেচনা করি তবে আমরা তাকে কেবল **মূর্ত, নির্দিষ্ট** অথবা বলা যায় **ঘনীভূত সামাজিক শ্রম** — এই একটা দিক থেকেই বিচার করি। এই দিক থেকে তাদের ভিতরে **পার্থক্য হতে** পারে কেবল তাদের মধ্যে নিহিত কম বা বেশি পরিমাণ শ্রম দিয়ে। যেমন একটা ইঁটের চেয়ে রেশমী রুমালের মধ্যে হয়ত বেশি পরিমাণ শ্রম নিহিত হয়েছে। কিন্তু **শ্রমের পরিমাণ** কী করে মাপা যায়? **যতক্ষণ শ্রম চলল সেই সময়টা** দিয়ে, ঘণ্টা, দিন প্রভৃতির মাপে শ্রমকে পরিমাপ করেই। অবশ্য এই মাপকাঠি প্রয়োগ করতে গেলে বিভিন্ন রকমের **শ্রমকে** দাঁড় করাতে হয় তাদের একক হিসেবে গড়পড়তা বা **সরল** শ্রমে।

তাই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হচ্ছি: পণ্যের **মূল্য** থাকে, কারণ তা **সামাজিক শ্রমের ঘনীভূত রূপ।** তার মূল্যের, অর্থাৎ **আপেক্ষিক** মূল্যের **বিপুলতা** নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত এই সামাজিক সারবস্তুর পরিমাণের কমবেশির ওপরে, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের জন্য যে শ্রম লাগে তার আপেক্ষিক পরিমাণের ওপরে। সুতরাং **পণ্যসমূহের আপেক্ষিক মূল্য যথাক্রমে তাদের মধ্যে নিযুক্ত, মূর্ত, নির্দিষ্ট শ্রমের পরিমাপ** বা **পরিমাণের দ্বারাই** নির্ধারিত হয়। **একই শ্রম-সময়ের মধ্যে** বিভিন্ন পণ্যের **যথাক্রমে** যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তা **সমান।** অথবা কোনো দুই পণ্যের মূল্যের অনুপাত যথাক্রমে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রম-পরিমাণের অনুপাতের সমান।

আমার আশঙ্কা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করবেন: তাহলে মজুরি দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং তার উৎপাদনের জন্য যে **আপেক্ষিক পরিমাণ** শ্রম লাগে তার দ্বারা নির্ধারণ এই দুয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই অত বিপুল, অথবা আদৌ কোনো পার্থক্য আছে? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, শ্রমের **পারিশ্রমিক** ও শ্রমের **পরিমাণ** হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এক কোয়ার্টার গম ও এক আউন্স সোনায় **সমান**

পরিমাণ শ্রম নিহিত আছে। আমি এ দৃষ্টান্ত নিচ্ছি কারণ **বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন** ১৭২৯ সালে প্রকাশিত 'কাগজী মুদ্রার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান' শীর্ষক তাঁর প্রথম প্রবন্ধে এটি ব্যবহার করেন; মূল্যের সত্যকার প্রকৃতি যাঁরা সবার আগে ধরতে পেরেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। যাই হোক, আমরা তাহলে ধরে নিচ্ছি যে, এক কোয়ার্টার গম ও এক আউন্স সোনা **সমান মূল্যের** বা **তুল্যমূল্য**, কারণ তারা হচ্ছে **সমান পরিমাণ গড়পড়তা শ্রমের ঘনীভূত রূপ**, তাদের মধ্যে যথাক্রমে অত দিন বা অত সপ্তাহের শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে। সোনা ও শস্যের আপেক্ষিক মূল্য এইভাবে নির্ধারণের সময়ে আমরা কি কোনক্রমে কৃষি-মজুর ও খনি-মজুরের **মজুরির** কথা টেনে আনছি? মোটেই না। রোজকার বা সপ্তাহের শ্রমের দরুন **কী ভাবে** তাদের পাওনা দেওয়া হয়েছিল অথবা মজুরি-শ্রম আদৌ নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা — এসব আমরা সম্পূর্ণ **অনির্ধারিত** রাখছি। মজুরি-শ্রম নিয়োগ করা হলেও মজুরি খুবই অসমান থাকতে পারে। এক কোয়ার্টার গমের মধ্যে যে মজুরের শ্রম রূপ পেয়েছে সে হয়ত পেয়েছে মাত্র দু'বুশেল গম আর খনিতে নিযুক্ত মজুরের জুটে থাকতে পারে ঐ এক আউন্স সোনার আধখানা। অথবা তাদের মজুরি সমান ধরলে সে-মজুরি তাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য থেকে সর্ববিধসম্ভব অনুপাতে ভিন্ন হতে পারে। এক কোয়ার্টার গম বা এক আউন্স সোনার অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ অথবা অন্য যে কোনো আনুপাতিক অংশ হতে পারে ঐ মজুরি। অবশ্য তাদের **মজুরি** তারা যে পণ্য উৎপাদন করছে তার মূল্যকে **ছাপিয়ে যেতে** বা তার থেকে **বেশি** হতে পারে না, কিন্তু তার থেকে **কম** হতে পারে সম্ভাব্য সবরকম মাত্রায়। উৎপন্ন সামগ্রীর **মূল্য** দিয়ে তাদের **মজুরি সীমাবদ্ধ** হবে, কিন্তু মজুরি দিয়ে **তাদের উৎপন্নের মূল্য** সীমাবদ্ধ হবে না। আর সর্বোপরি মূল্য, উদাহরণস্বরূপ শস্য ও সোনার আপেক্ষিক মূল্য স্থির হবে নিহিত শ্রমের মূল্য অর্থাৎ **মজুরির** সাথে কোনরকম সম্পর্ক না রেখেই। যে **আপেক্ষিক পরিমাণ শ্রম তাদের মধ্যে বিধৃত** আছে তাই দিয়ে পণ্যসমূহের মূল্য বিচার হল শ্রমের মূল্য বা **মজুরি** দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের যে একই কথা বলার পদ্ধতি রয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই ব্যাপারটা অবশ্য পরে এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

কোনো পণ্যের বিনিময়-মনূল্য নিরনুপণের সময় **সর্বশেষে** যে শ্রম নিয়োগ করা হল তার পরিমাণের সঙ্গে পণ্যের কাঁচামালের ভিতরে **ইতিপনূর্বেই** যে শ্রম বিধনৃত রয়েছে এবং যেসব সরঞ্জাম, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও বাড়িঘরের সহায়তা নিয়ে ঐ শ্রম করা হয়েছে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণটাও যোগ দিতে হবে। দনৃষ্টান্তস্বরনূপ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সনুতোর মনূল্য হল সনুতো কাটা প্রক্রিয়ায় তুলার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম যোগ করা হল, তুলার নিজের ভিতরেই ইতিপনূর্বে যে পরিমাণ শ্রম মনূর্ত ছিল, কয়লা, তেল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যেসব সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে তাদের ভিতরে যে পরিমাণ শ্রম মনূর্ত রয়েছে, বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও টাকু বা কারখানাঘর প্রভৃতিতে যে পরিমাণ শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে, এ সব কিছনু শ্রমের ঘনীভূত রনূপ। সঠিকভাবে যাকে উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়, যেমন হাতিয়ারপত্র, যন্ত্রপাতি, ভবন, উৎপাদনের পৌনঃপনুনিক প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি কাল ধরে এগনুলো বারবার ব্যবহৃত হয়। কাঁচামালের মতো এগনুলি যদি এক দফাতেই ব্যবহৃত হয়ে যেত তাহলে যেসব পণ্য উৎপাদনে এরা সহায়তা করে তাদের মধ্যে এদের সমগ্র মনূল্যই হয়ে যেত সঞ্চারিত। কিন্তু, দনৃষ্টান্তস্বরনূপ, যেহেতু একটি টাকু ক্রমশ ক্ষয় পায় তাই তার গড় আয়নুষ্কালের উপরে ভিত্তি করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ধরনুন একদিনে তার মোটামনুটি ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অপচয়ের উপরে ভিত্তি করে একটা গড়পড়তা হিসাব করা হয়। এইভাবে আমরা হিসাব করি প্রতিদিন যে সনুতো কাটা হয় তার মধ্যে টাকুর কতটা মনূল্য সঞ্চারিত হচ্ছে, এবং ধরনুন এক পাউণ্ড সনুতোর মধ্যে যে মোট পরিমাণ শ্রম বিধনৃত থাকে তার মধ্যে কতটা অংশ উক্ত টাকুটির মধ্যে নিহিত শ্রম পরিমাণ থেকে পাওয়া গেল। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ ব্যাপার নিয়ে আর বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

মনে হতে পারে যে পণ্যের মনূল্য যদি **তার উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম বিধনৃত হয়েছে** তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাহলে মানুষ যত কুড়ে বা যত বেশি আনাড়ি হবে তার পণ্যও তত মনূল্যবান হবে, কারণ পণ্য তৈরি করতে পরিশ্রমের সময় তার বেশি লাগবে। এটা অবশ্য একটা শোচনীয় ভুল। আপনাদের হয়ত মনে আছে যে আমি এর আগে '**সামাজিক** শ্রম' কথাটি ব্যবহার করেছি এবং '**সামাজিক**' এই বৈশিষ্ট্য আরোপের মধ্যে অনেক কথাই

নিহিত আছে। পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার মধ্যে যে **পরিমাণ শ্রম বিধৃত** বা ঘনীভূত রয়েছে — একথা বলতে তাই সমাজের একটা নির্দিষ্ট অবস্থায়, উৎপাদনের কতকগুলি নির্দিষ্ট সামাজিক গড়পড়তা পরিস্থিতিতে, বিশেষ এক সামাজিক গড়পড়তা প্রখরতায়, এবং নিয়োজিত শ্রমের গড়পড়তা দক্ষতার সাহায্যে পণ্য উৎপাদনে যে **পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন** হয় তার কথা বোঝাচ্ছি। ইংলণ্ডে হাতে-চালানো তাঁতের সঙ্গে কলের তাঁত যখন পাল্লা দিয়ে এল, তখন একটা বিশেষ পরিমাণ সুতোকে এক গজ কাপড়ে পরিণত করতে আগে যতক্ষণ শ্রম করতে হত তার মাত্র অর্ধেক সময়ের প্রয়োজন হল। অবশ্য হাতে-চালানো তাঁতের তাঁতী বেচারাকে আগে যেখানে নয়-দশ ঘণ্টা কাজ করলেই চলত এখন সেখানে দিনে সতেরো-আঠারো ঘণ্টা খাটতে হল। তবুও তার নিজস্ব শ্রমের বিশ ঘণ্টার ফল এখন মাত্র দশ ঘণ্টা সামাজিক শ্রমের, অর্থাৎ এক বিশেষ পরিমাণ সুতোকে কাপড়ে পরিণত করতে সামাজিকভাবে আবশ্যিক দশ ঘণ্টা শ্রমের তুল্য হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং তার বিশ ঘণ্টার শ্রমের ফলের এখন যা মূল্য সেটা পূর্বেকার দশ ঘণ্টা শ্রমের ফলের চেয়ে বেশি নয়।

অতএব পণ্যে যে পরিমাণ সামাজিকভাবে আবশ্যিক শ্রম মূর্ত হয়েছে তাই যদি তার বিনিময়-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে কোনো পণ্য উৎপাদনে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার মূল্যও বৃদ্ধি পাবে, আর তা হ্রাস পেলে মূল্যও হ্রাস পাবে।

বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ যদি স্থির থাকে তাহলে তাদের আপেক্ষিক মূল্যও স্থির থাকবে। কিন্তু তা ঘটে না। নিয়োজিত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের পক্ষে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণও ক্রমাগত বদলাতে থাকে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত বেশি হবে, এক বিশেষ শ্রম-সময়ের মধ্যে তত বেশি জিনিস উৎপন্ন হবে; আর শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত কম হবে, সেই সময়ের মধ্যে জিনিস তত কম তৈরি হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিগুলি চাষ করার দরকার পড়ে তাহলে একই পরিমাণ ফসল পাওয়া যেতে পারে কেবল বেশি পরিমাণে শ্রম করেই, আর কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্যও তার ফলে বেড়ে যাবে। অন্যদিকে আধুনিক উৎপাদনের উপায়ের সাহায্যে একদিনের শ্রমে একজন সুতোকাটুনী যদি

ঐ একই সময়ে চরকায় কাটা সুতোর বহু হাজার গুণ সুতো কাটতে পারে, তাহলে এটাও পরিষ্কার যে, প্রতি পাউন্ড তুলায় আগের থেকে বহু হাজার গুণ কম সুতোকাটুনী শ্রম নিহিত থাকবে, কাজেই প্রতি পাউন্ড তুলোর সঙ্গে সুতো কাটার ফলে যে মূল্য যুক্ত হবে তা আগের তুলনায় হাজার ভাগ কম। সুতোর মূল্যও পড়ে যাবে সেই অনুপাতে।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম স্বাভাবিক কর্মশক্তি ও অর্জিত কর্মদক্ষতার কথা বাদ দিলে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি প্রধানত নির্ভর করবে:

প্রথমত, শ্রমের **প্রাকৃতিক** অবস্থার উপরে, যেমন জমির উর্বরতা, খনির সমৃদ্ধি ইত্যাদি;

দ্বিতীয়ত, **শ্রমের সামাজিক শক্তির** ক্রমান্বয় উন্নতিসাধনের ওপর, যা আসে বিপুল মাত্রায় উৎপাদন, পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সংযোজন, শ্রমের বিভাজন, যন্ত্রের প্রয়োগ, উন্নত পদ্ধতি, রাসায়নিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ ও পরিবহণের ফলে দেশ ও কালের সংকোচন, এবং আর যেসব কৌশলে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিকে শ্রমের কাজে লাগায় ও যাতে শ্রমের সামাজিক বা সমবায়ী চরিত্র বিকশিত হয়, তা থেকে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত বেশি হয়, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রীর উপর ব্যয় হয় তত কম শ্রম। কাজেই সেই সামগ্রীর মূল্যও ততই কম হবে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত কম হয় সম পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রী তত বেশি শ্রমসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই ততই বেশি হয় তার মূল্য। একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে তাই আমরা বলতে পারি:

পণ্যের মূল্য নির্ণীত হয় তার উৎপাদনে যতটা শ্রম-সময় প্রযুক্ত হয় তার সাক্ষাৎ অনুপাতে এবং প্রযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিপরীত অনুপাতে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু **মূল্যের** কথা বলার পরে এবার আমি **দাম** সম্পর্কে কয়েকটি কথা যোগ করব। দাম হচ্ছে মূল্যেরই একটি বিশেষ রূপ।

স্বতন্ত্রভাবে দেখলে **দাম মূল্যের মুদ্রাগত অভিব্যক্তি** ছাড়া আর কিছু নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে সমস্ত পণ্যের মূল্য সোনার দামের মারফৎ প্রকাশ পায় আর ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তার প্রকাশ প্রধানত রূপোর দামের মারফৎ। অন্যান্য পণ্যের মতো সোনা বা রূপোর মূল্যও নিয়ন্ত্রিত হয় তা আহরণের জন্য যে শ্রম লাগে তার পরিমাণ দ্বারাই। আপনাদের দেশের উৎপন্নের একটা

নির্দিষ্ট পরিমাণ যার মধ্যে দেশবাসীদের **শ্রমেরই** একটা নির্দিষ্ট **পরিমাণ** ঘনীভূত রয়েছে, তা আপনারা বিনিময় করছেন সোনা ও রূপা উৎপাদনকারী অন্য দেশের উৎপন্নের সঙ্গে, যার মধ্যে ঘনীভূত রয়েছে **তাদের** শ্রমেরও নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ। এইভাবেই আসলে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেই আপনারা সমস্ত পণ্যের মূল্যকে অর্থাৎ ঐসব পণ্যের উপরে যথাক্রমে যে শ্রম প্রযুক্ত হয়েছে তাকে, সোনা ও রূপায় প্রকাশ করতে শেখেন। **মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ** বা অন্য কথায় **মূল্যের দামে রূপান্তরের** ব্যাপারটিকে একটু তলিয়ে দেখলে আপনারা বুঝবেন যে, সেটা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা আপনি সমস্ত পণ্যের **মূল্যকে** একটা **স্বাধীন ও সমমাত্রিক রূপ** দিচ্ছেন, অথবা যার দ্বারা আপনি তাদের প্রকাশ করছেন **সমান** সামাজিক শ্রমের বিভিন্ন পরিমাণরূপে। এই পর্যন্ত যেহেতু দাম হচ্ছে মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ মাত্র, সেহেতু **অ্যাডাম স্মিথ** তাকে বলেছেন **স্বাভাবিক দাম,** ফরাসী ফিজিওক্রাটরা বলেছেন **'আবশ্যিক দাম'** [prix nécessaire]

মূল্য ও **বাজার-দর** অথবা **স্বাভাবিক দাম** ও **বাজার-দরের** মধ্যে **সম্পর্ক**টা তাহলে কী? আপনারা সবাই জানেন, ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদনের অবস্থায় যতই তারতম্য থাকুক না কেন, একই ধরনের সমস্ত পণ্যের **বাজার-দর একই**। উৎপাদনের গড়পড়তা পরিস্থিতিতে, বাজারে একটি বিশেষ সামগ্রী নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করার জন্য **সামাজিক শ্রমের** যে **গড়পড়তা পরিমাণ** প্রয়োজন হয়, বাজার-দর তাকেই প্রকাশ করে। নির্দিষ্ট ধরনের কোনো পণ্যের সমগ্র পরিমাণের উপরেই এই হিসাব করা হয়।

একটা পণ্যের **বাজার-দর** আর তার **মূল্য** এই পর্যন্ত একই। অন্যদিকে মূল্য বা স্বাভাবিক দামের কখনো উপরে, কখনো বা নিচে বাজার-দরের যে উঠতি-পড়তি, তা যোগান ও চাহিদার ওঠানামার ওপরেই নির্ভরশীল। মূল্য থেকে বাজার-দর অনবরত বিচ্যুত হয়ে চলে, কিন্তু **অ্যাডাম স্মিথের** কথা অনুসারে,

স্বাভাবিক দাম হচ্ছে যেন কেন্দ্রীয় দাম, যার দিকে সমস্ত পণ্যের দাম ক্রমাগতই আকর্ষিত হচ্ছে। নানা আকস্মিক ঘটনা কখনো কখনো দামকে ঐ স্বাভাবিক দামের বহু উপরে উঠিয়ে দিতে পারে, কখনো বা এমন কি তার কিছুটা নিচেও নামিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু স্থিরতা ও অপরিবর্তনীয়তার এই কেন্দ্রে স্থিতিলাভ করার পথে যে প্রতিবন্ধকই ব্যাহত করুক না কেন, ওরই (ওই) দিকে দামের অবিরত আকর্ষণ।'

এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের অবকাশ নেই। শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, **যদি** যোগান ও চাহিদা পরস্পরের ভারসাম্য ঘটায়, তাহলে পণ্যের বাজার-দর তার স্বাভাবিক দাম অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের যথাক্রমিক পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত যে মূল্য তারই অনুরূপ হবে। কিন্তু যোগান ও চাহিদা পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য ঘটাবার চেষ্টা **করবেই** যদিও তা করবে মাত্র এক ধরনের বিচ্যুতিকে আর এক ধরনের বিচ্যুতি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে, উঠতিকে পড়তি দিয়ে এবং পড়তিকে উঠতি দিয়ে। শুধু রোজকার উঠতি-পড়তি বিচারের বদলে আপনারা যদি দীর্ঘতর কাল জুড়ে বাজার-দরের গতি বিশ্লেষণ করেন, যেমন করেছেন মিঃ টুক তাঁর **'দামের ইতিহাস'** গ্রন্থে, তাহলে দেখবেন যে, বাজার-দরের হ্রাসবৃদ্ধি, মূল্য থেকে তাদের বিচ্যুতি, তাদের ওঠানামা পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে ও পরস্পরের ক্ষতিপূরণ করে। কাজেই একচেটিয়া শিল্পের ফলাফল ও আরো কয়েকটি ব্যতিক্রমের প্রসঙ্গ যা আমাকে আপাতত এড়িয়ে যেতে হচ্ছে তাদের বাদ দিলে, সব ধরনের পণ্যই গড়ে তাদের নিজ নিজ **মূল্য** বা স্বাভাবিক দামেই বিক্রয় হয়। যে গড়পড়তা কালের মধ্যে বাজার-দরের উঠতি-পড়তি পরস্পরের কাটাকুটি করে যায় তা ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, কারণ চাহিদার সঙ্গে যোগান খাপ খাওয়ানো কোনো একটা পণ্যের পক্ষে সহজ, কোনো পণ্যের পক্ষে কঠিন।

কাজেই মোটামুটিভাবে এবং কিছুটা দীর্ঘতর কাল হিসাবে ধরলে যদি বলা চলে সবরকমের পণ্য তাদের আপন আপন মূল্যেই বিক্রয় হয়, তাহলে বিশেষ কোনো একটি ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন ব্যবসায়ের নিয়মিত ও স্বাভাবিক মুনাফা উদ্ভূত হয় পণ্যের দাম **বাড়িয়ে** অথবা **মূল্যের** তুলনায় উচ্চতর দামে তাকে বিক্রয় করে — একথা ভাবা অর্থহীন। সামগ্রিকভাবে উপস্থিত করলে এ ধারণার অসম্ভাব্যতা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বিক্রেতা হিসেবে লোকে অনবরত যা লাভ করতে থাকবে, সমান অনবরত তাই লোকসান দেবে ক্রেতা হিসেবে। একথা বললে চলবে না যে, এমন মানুষ আছে যারা বিক্রেতা

নয়, শুধুই ক্রেতা বা উৎপাদক নয়, শুধুই ভোক্তা। এই লোকেরা উৎপাদকদের যা দিয়ে থাকে তা প্রথমে উৎপাদকদের কাছ থেকেই বিনা প্রতিদানেই তাদের পাওয়া চাই। যদি কোনো লোক প্রথমে আপনার টাকা নেয় ও পরে আপনার পণ্য কিনতে গিয়ে সেই টাকাই ফেরৎ দেয়, তাহলে আপনি ঐ লোকের কাছে পণ্য অতিরিক্ত চড়া দামে বিক্রয় করে কখনই বড়লোক হতে পারবেন না। এই ধরনের লেনদেন হয়তো লোকসান কমাতে পারে, কিন্তু কখনও মুনাফা কামাতে সহায়তা করবে না।

সুতরাং **মুনাফার সাধারণ প্রকৃতি** ব্যাখ্যা করতে গেলে আপনাকে শুরু করতে হবে এই সূত্র থেকেই যে, গড়পড়তা হিসাবে পণ্য **বিক্রয় হয় তার আসল মূল্যে** এবং **পণ্যকে তার মূল্যে** অর্থাৎ তার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম নিহিত রয়েছে সেই অনুপাতে **বিক্রি করেই মুনাফা অর্জিত হয়।** এই কথাটি মেনে নিয়ে যদি আপনি মুনাফার হেতু নির্ধারণ না করতে পারেন তাহলে কোনদিনই আপনি তার হদিশ পাবেন না। কথাটা আপাতবিরোধী ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বোধ হয়। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে আর জল যে দুটি ভীষণ দাহ্য বাষ্প দিয়ে গড়া এও তো আপাতবিরোধী। পদার্থের বিভ্রান্তিকর বাহ্যরূপটাই শুধু ধরা পড়ে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়, তাই সেই অভিজ্ঞতার দৃষ্টি থেকে বৈজ্ঞানিক সত্য তো সর্বদাই আপাতবিরোধী।

৭। শ্রম-শক্তি

তাড়াহুড়ো করে যতটা সম্ভব তার মধ্যে **মূল্যের, যে কোনো পণ্যের মূল্যের** প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার পর এখন আমাদের নজর ফেরাতে হবে বিশেষ করে **শ্রমের মূল্যের** দিকে। আর এখানেও আবার এক আপাতবিরোধী বক্তব্য দিয়ে আপনাদের চমকে দিতে হবে। আপনাদের সকলেরই নিশ্চিত ধারণা এই যে, প্রত্যহ শ্রমিকেরা যা বিক্রয় করে তা হচ্ছে তাদের শ্রম, তাই শ্রমের একটা দাম আছে আর যেহেতু পণ্যের দাম শুধু তার মূল্যের মুদ্রাগত অভিব্যক্তি, তাই **শ্রমের মূল্য** বলেও নিশ্চয় একটা জিনিস আছে। কিন্তু

সাধারণভাবে কথাটি যে অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেভাবে **শ্রমের মূল্য** বলে কোনো জিনিসই নেই। আমরা দেখেছি পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় শ্রম ঘনীভূত থাকে তাই হল তার মূল্য। এখন, মূল্য সম্পর্কে এই ধারণা প্রয়োগ করে কী করে আমরা, ধরুন, দশ ঘণ্টা খাটুনির রোজের মূল্য বিচার করব? ঐ রোজের ভিতর কতটা শ্রম আছে? দশ ঘণ্টার শ্রম। দশ ঘণ্টার খাটুনির রোজের মূল্য দশ ঘণ্টার শ্রম বা তার মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণ একথা বলা মানে কেবল একই কথা ঘুরিয়ে বলা এবং তদুপরি একটা অর্থহীন কথা বলার সামিল। অবশ্য **'শ্রমের মূল্য'** কথাটির প্রকৃত অথচ প্রচ্ছন্ন অর্থটি একবার ধরতে পারলে আমরা মূল্যের এই অযৌক্তিক আপাত-অসম্ভব প্রয়োগের ব্যাখ্যা করতে পারব, ঠিক যেমন নভোচারী গ্রহ নক্ষত্রের প্রকৃত গতি সম্পর্কে একবার নিশ্চিত হতে পারলে আমরা তাদের আপাতগোচর অথবা কেবল পরিদৃশ্যমান গতিবিধিরও ব্যাখ্যা করতে পারি।

শ্রমিক যা বিক্রয় করে তা সরাসরি তার **শ্রম** নয়, বরং তার **শ্রম-শক্তি**, সাময়িকভাবে সেটা সে তুলে দেয় পুঁজিপতির হাতে। ব্যাপারটা এতই সঠিক যে, ইংরাজী আইনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশের আইন অনুসারে তো বটেই, একজন মানুষ কতক্ষণ তার শ্রম-শক্তি বেচতে পারবে তার ঊর্ধ্বতম সময় নির্দেশ করা আছে। যে কোনো অনির্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম-শক্তি বিক্রয় মঞ্জুর করা মাত্রই সেটা হবে দাসত্ব প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বিক্রয় যদি জীবদ্দশা পর্যন্ত ধরা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক এতে মালিকের আজীবন ক্রীতদাস হয়ে পড়বে।

ইংলণ্ডের প্রাচীনতম অর্থতাত্ত্বিক ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তার দার্শনিকদের অন্যতম **টমাস হবস** ইতিপূর্বেই তাঁর **'লেভিয়াথান'** নামক গ্রন্থে পরবর্তী সমস্ত পণ্ডিতদের দ্বারা উপেক্ষিত এই ব্যাপারটিকে সহজ বুদ্ধির বলে আঁচ করে যান। তিনি বলেন,

> 'অন্যান্য জিনিসের মতো মানুষের মূল্য বা কদর হচ্ছে তার যা দাম, অর্থাৎ তার শক্তি ব্যবহারের জন্য তাকে যতটা দেওয়া হবে তাই।'

এই ভিত্তি থেকে শুরু করলে আমরা অন্যান্য পণ্যের মতো **শ্রমের মূল্যও** স্থির করতে পারি।

কিন্তু তা করার আগে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি: বাজারে যে চোখে পড়ে একদিকে একদল ক্রেতা যারা জমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও জীবনধারণের উপকরণাদি, যার মধ্যে অনাবাদী জমি ছাড়া বাকি সবই হল **শ্রমোৎপন্ন জিনিস**, এ সমস্ত কিছুরই মালিক, এবং অন্যদিকে অপর একদল বিক্রেতা, যাদের শ্রম-শক্তি, খাটবার দু-খানা হাত ও মাথা ছাড়া বেচবার মতো আর কিছুই নেই — এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে কী করে? একটি দল মুনাফা লুটবার ও বড়লোক হবার জন্য ক্রমাগত কিনছে আর অপর দলটি জীবিকা অর্জনের জন্য ক্রমাগত বেচছে — এ কেমন ঘটনা। এই প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধানের অর্থ হচ্ছে অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন **'পূর্ববর্তী** বা **আদি সঞ্চয়'**, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাকে বলা উচিত **আদি লুণ্ঠন,** তার সম্পর্কে অনুসন্ধান। আমরা দেখতে পাব যে, এই তথাকথিত **আদি সঞ্চয়** এমন কতগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয় যার ফল হল মেহনতী মানুষের সঙ্গে তার শ্রমের উপকরণের **আদি ঐক্যের ভাঙন।** সে অনুসন্ধান অবশ্য আমার বর্তমান বিচার্য বিষয়ের বাইরে। মেহনতী মানুষ এবং তার শ্রমের উপকরণের ভিতরকার **বিচ্ছেদ** একবার কায়েম হয়ে যাবার পর সে অবস্থা চালু থাকবে আর ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তার ব্যাপকতা বেড়ে চলবে, যতদিন না উৎপাদন-পদ্ধতিতে নূতন ও মূলগত এক বিপ্লব আবার তাকে উলটিয়ে দেয় এবং নতুন এক ঐতিহাসিক রূপে সেই আদি ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটায়।

শ্রম-শক্তির মূল্য তাহলে কী?

অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই এর মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ দ্বারাই। মানুষের শ্রম-শক্তির অস্তিত্ব শুধু তার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যেই। বেড়ে ওঠা ও বেঁচে থাকার জন্যই মানুষকে কতকগুলি আবশ্যিক দ্রব্যাদি ভোগ করতেই হয়। কিন্তু মানুষও যন্ত্রের মতোই জীর্ণ হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় অন্য মানুষকে নিতে হবে। **তার নিজের** জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তা ছাড়াও শ্রমের বাজারে তার স্থান গ্রহণ এবং শ্রমিকদের বংশ রক্ষা করতে পারে এমন কিছু সংখ্যক সন্তান পালনের জন্য সে চায় আরও কিছু পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি। তাছাড়া তার শ্রম-শক্তির উন্নয়ন ঘটাতে ও নির্দিষ্ট একটা

দক্ষতা অর্জন করতে হলে আরও কিছু পরিমাণ মূল্য খরচ করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে শুধুমাত্র **গড়পড়তা** শ্রমের বিচারই যথেষ্ট, যার মধ্যে শিক্ষণ ও উন্নয়নের খরচটা নগণ্য পরিমাণ। তবু এই উপলক্ষের সুযোগে আমি বলতে চাই যে, যেমন বিভিন্ন গুণাগুণের শ্রম-শক্তি উৎপাদনের খরচও বিভিন্ন, তেমনই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রম-শক্তির মূল্যও ভিন্ন হতে বাধ্য। **সমান মজুরির** জন্য সোরগোলটা তাই একটা ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে হল এমন এক **নির্বোধ** কামনা যা কখনও সার্থক হবার নয়। এই দাবি আসছে সেই মিথ্যা ও ভাসাভাসা এক র‍্যাডিকালপনা থেকে যা হেতুভিত্তিটা মানে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত এড়াবার চেষ্টা করে। মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে শ্রম-শক্তির মূল্য অন্য যে কোনো পণ্যের মূল্যের মতো একই পদ্ধতিতে স্থির হয়, আর যেহেতু বিভিন্ন ধরনের শ্রম-শক্তির মূল্য বিভিন্ন, অর্থাৎ তা উৎপন্নের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন, তাই শ্রমের বাজারে তারা অবশ্যই বিভিন্ন দাম **পাবেই**। দাসপ্রথার ভিত্তিতে **স্বাধীনতার** জন্য গলাবাজি করাও যা, মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে **সমান এমন কি ন্যায্য পারিশ্রমিকের** জন্য হৈচৈ করাও তাই। আপনি যাকে ঠিক বা ন্যায্য বলে মনে করেন সে প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্ন হচ্ছে: একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনটা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ?

যা বলা হল তার থেকে দেখা যাবে যে, **শ্রম-শক্তির মূল্য** নির্ধারিত হয় সেই শ্রম-শক্তির উৎপাদন, উন্নয়ন, পোষণ ও ধারারক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় **আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যের দ্বারাই।**

৮। বাড়তি মূল্যের উৎপাদন

এখন ধরুন, একজন শ্রমিকের গড়ে প্রতিদিন যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তার উৎপাদনের জন্য **ছয় ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম** লাগে। এও ধরে নিন যে, ৩ শিলিং পরিমাণ সোনার মধ্যেও নিহিত রয়েছে ছয় ঘণ্টা গড়পড়তা শ্রম। তাহলে ঐ মানুষটির **শ্রম-শক্তির প্রাত্যহিক মূল্যের দাম** বা মুদ্রাগত রূপ হচ্ছে ৩ শিলিং। সে প্রতিদিন যদি ছয় ঘণ্টা খাটে তাহলে

প্রতিদিন গড়ে তার যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি প্রয়োজন ঠিক ততটা ক্রয়ের মতো, অর্থাৎ মেহনতী হিসেবে নিজেকে বজায় রাখার মতো মূল্য সে উৎপন্ন করতে পারে।

কিন্তু আমাদের এই মানুষটি হচ্ছে মজুরি-খাটা শ্রমিক। কাজেই পুঁজিপতির কাছে তাকে তার শ্রম-শক্তি বিক্রি করতেই হবে। সে যদি রোজ ৩ শিলিং-এ অথবা সপ্তাহে ১৮ শিলিং-এ শ্রম-শক্তি বেচে তবে সে প্রকৃত মূল্যেই তা বেচবে। ধরুন, সে একজন সুতো কাটুনী। প্রতিদিন যদি সে ছ'ঘণ্টা খাটে তাহলে তুলার সঙ্গে সে রোজ ৩ শিলিং মূল্য যোগ করবে। এইভাবে প্রতিদিন সে যে মূল্য যোগাবে তা হবে সে প্রতিদিন যে মজুরি অথবা শ্রম-শক্তির দাম পাচ্ছে ঠিক তার সমান। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনো **উদ্বৃত্ত মূল্য** বা **উদ্বৃত্ত উৎপন্ন** পুঁজিপতির হাতে যাবে না। এইখানেই হল মুশকিল।

মজুরের শ্রম-শক্তি কেনার ও তার মূল্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে কোনো ক্রেতার মতোই পুঁজিপতি ক্রীত পণ্যকে ভোগ বা ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করেছে। যন্ত্র চালিয়েই যেমন আপনি যন্ত্রকে ভোগ বা ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি মানুষকে খাটিয়েই আপনি ভোগ বা ব্যবহার করেন তার শ্রম-শক্তিকে। সুতরাং মজুরের শ্রম-শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক মূল্য দিয়ে পুঁজিপতি **গোটা দিন বা সপ্তাহ** জুড়ে তাকে ব্যবহার অর্থাৎ খাটাবার অধিকার অর্জন করেছে। অবশ্য শ্রম-দিবস, শ্রম-সপ্তাহের কতগুলি সীমা আছে, পরে আমরা আরো ভাল করে সেদিকে নজর দেব।

বর্তমানে একটি চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রম-শক্তির **মূল্য** তার পরিপোষণ বা পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, কিন্তু সেই শ্রম-শক্তির **ব্যবহার** কেবল শ্রমিকের সক্রিয় কর্মক্ষমতা ও শারীরিক শক্তি দিয়েই সীমায়িত। শ্রম-শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক মূল্য ঐ শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **প্রয়োগের** থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, ঠিক যেমন ঘোড়ার যে খাদ্য দরকার আর যে সময় ধরে সে আরোহীকে নিয়ে বেড়াতে পারে, এ দুটো হচ্ছে একেবারেই আলাদা জিনিস। শ্রম-শক্তির মূল্য যে পরিমাণ শ্রমের দ্বারা সীমাবদ্ধ সেটা কখনই তার সেই শক্তি যে পরিমাণ শ্রম করতে সক্ষম তার

সীমা নির্ধারণ করে না। আমাদের **সুতোকাটুনীর** দৃষ্টান্তেই নিন। **আমরা** দেখেছি যে, প্রতিদিন তার **শ্রম-শক্তি পুনরুৎপাদনের** জন্য তাকে প্রতিদিনই তিন শিলিং মূল্য পুনরুৎপাদন করতে হবে, প্রতিদিন ছ'ঘণ্টা খেটেই সে তা করতে পারে। অথচ এর ফলে প্রতিদিন দশ, বারো বা আরো বেশি ঘণ্টা খাটতে সে অপারগ হয়ে পড়ে না। কিন্তু সুতোকাটুনীর **শ্রম-শক্তির** প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **মূল্য** দিয়ে পুঁজিপতি **গোটা দিন বা সপ্তাহ** জুড়ে সেই শক্তি ব্যবহারের অধিকার অর্জন করেছে। কাজেই সে তাকে, ধরুন, রোজ **বারো** ঘণ্টা খাটাবে। মজুরি হিসেবে তাকে যা দেওয়া হয় তা তুলে নেবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছ'ঘণ্টার ওপরেও অর্থাৎ তার শ্রম-শক্তির মূল্যের **ওপরেও** তাই তাকে **আরো ছ-ঘণ্টা** খাটতে হবে; সময়টাকে আমি বলব **বাড়তি শ্রমের** ঘণ্টা, এ বাড়তি শ্রম আবার **বাড়তি মূল্যে ও বাড়তি উৎপন্নের** মধ্যে রূপায়িত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের সুতোকাটুনী যদি তার দৈনন্দিন ছ-ঘণ্টা শ্রমের ফলে তুলার সঙ্গে তিন শিলিং মূল্য যোগ করে থাকে, যে মূল্য হচ্ছে ঠিক তার মজুরির সমান, তাহলে বারো ঘণ্টায় সে তুলার সঙ্গে ছ-শিলিং মূল্য যোগ করবে এবং **সেই অনুপাতে বাড়তি সুতো** তৈরী করবে। কিন্তু সে তার শ্রম-শক্তি পুঁজিপতিকে বেচেছে বলে তার উৎপন্নের সমগ্র মূল্য যাবে পুঁজিপতির কাছে, তার শ্রম-শক্তির তৎকালীন মালিকের মালিকানায়। তিন শিলিং আগাম দিয়ে পুঁজিপতি তাই ছ-শিলিং মূল্য উশুল করবে, কারণ ছ'ঘণ্টার শ্রম ঘনীভূত হয়েছে এমন মূল্য আগাম দিয়ে পুঁজিপতি তার বদলে পাচ্ছে এমন একটা মূল্য যার ভিতরে রূপ লাভ করেছে বারো ঘণ্টার শ্রম। প্রতিদিন এই একই প্রক্রিয়া চালিয়ে পুঁজিপতি রোজ আগাম দেবে তিন শিলিং আর রোজ পকেটে পুরবে ছ-শিলিং যার অর্ধেক যাবে ফের মজুরি দেবার জন্য, আর বাকি অর্ধেক হবে **বাড়তি মূল্য,** যার বদলে পুঁজিপতিকে কোনো প্রতিমূল্য দিতে হবে না। **পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে এই ধরনের বিনিময়ের** উপরেই প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী উৎপাদন বা মজুরি শ্রমের ব্যবস্থা এবং এই থেকেই মজুরের মজুর হিসেবে আর পুঁজিপতির পুঁজিপতি হিসেবে অবিরাম পুনরুৎপাদন হতে থাকে।

বাকি সমস্ত অবস্থা যথাপূর্ব থাকলে **বাড়তি মূল্যের হার** নির্ভর করবে শ্রম-শক্তির মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য শ্রম-দিবসের যে অংশটি প্রয়োজন

তার সঙ্গে পুঁজিপতির জন্য যে **বাড়তি সময়** বা **বাড়তি শ্রম** দেওয়া হয় তার অনুপাতের ওপরেই। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে মজুর তার শ্রম-শক্তির মূল্য পুনঃসৃষ্টি করে বা তার মজুরি পরিশোধ করে, **তার ওপরেও শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য যে হারে বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে** সেই হারের উপর তা নির্ভর করবে।

৯। শ্রমের মূল্য

এবার আমাদের ফিরতে হবে **'শ্রমের মূল্য বা দাম'** কথাটিতে।

আমরা দেখেছি যে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু শ্রম-শক্তির মূল্য, যা মাপা হয় ঐ শক্তিকে পরিপোষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য দিয়ে। কিন্তু যেহেতু মজুর তার মজুরি পায় **শ্রম সম্পাদনের পরে**, তাছাড়া এও সে জানে যে, পুঁজিপতিকে আসলে যা সে দিচ্ছে তা হল তার শ্রম, সেহেতু তার শ্রম-শক্তির মূল্য বা দাম তার কাছে স্বভাবতই প্রতিভাত হয় **তার শ্রমেরই দাম** বা **মূল্য** হিসেবে। তার শ্রম-শক্তির দাম যদি হয় তিন শিলিং যার ভিতরে নিবদ্ধ থাকছে ছ'ঘণ্টার শ্রম আর যদি সে খাটে বারো ঘণ্টা জুড়ে, তাহলে স্বভাবতই তার মনে হয় যে এই তিন শিলিংই হচ্ছে তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য বা দাম, যদিও তার ঐ বারো ঘণ্টার শ্রম রূপ লাভ করছে ছ-শিলিং মূল্যের মধ্যে। এর থেকে দু-রকম ফলাফলের উদ্ভব হয়:

প্রথমত, **শ্রম-শক্তির মূল্য বা দাম, শ্রমেরই দাম বা মূল্যের** আকারে প্রতিভাত হয়, যদিও সঠিকভাবে বলতে গেলে শ্রমের মূল্য ও শ্রমের দাম কথাটা অর্থহীন।

দ্বিতীয়ত, যদিও মজুরের প্রতিদিনকার শ্রমের একটি অংশের জন্যই শুধু তাকে **পারিশ্রমিক দেওয়া হয়** ও অপর অংশের জন্য তাকে **কিছুই দেওয়া হয় না**, আর যদিও ঠিক ঐ বিনা পয়সার বাড়তি শ্রম থেকেই সেই তহবিল গড়ে ওঠে যার থেকে আসে **বাড়তি মূল্য** বা **মুনাফা**, তবু মনে হয় মোট শ্রমের জন্যই বুঝি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে।

এই ভ্রান্ত প্রতীতিই শ্রমের অন্যান্য **ঐতিহাসিক** রূপগুলি থেকে **মজুরি-শ্রমকে** একটা বিভিন্নতা দান করে। মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে এমন কি **পারিশ্রমিকহীন** শ্রমকেও **পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত** শ্রম বলে বোধ হয়। উল্টোদিকে **ক্রীতদাসের** বেলায় তার শ্রমের যে অংশটির জন্য তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, মনে হয় যেন তার জন্যও তাকে কিছুই দেওয়া হয় নি। কাজ করতে গেলে অবশ্যই ক্রীতদাসকে বাঁচতে হবে, তাই তার শ্রম-দিবসের একাংশ তার নিজের জীবনধারণের মূল্য সংস্থান করতেই যায়। কিন্তু তার ও তার প্রভুর মধ্যে যেহেতু কোনো লেনদেন হয় নি, এবং দু-পক্ষের মধ্যে যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার চলে না, তাই মনে হয় যেন তার সমস্ত শ্রমের বদলে বুঝি সে কিছুই পেল না।

অন্যদিকে, বলতে পারি এই সেদিন অবধি গোটা পূর্ব ইউরোপে যার অস্তিত্ব ছিল সেই কৃষক-ভূমিদাসের কথাটা ধরুন। এই কৃষক-ভূমিদাস তার নিজের বা বরাদ্দ জমিটুকুতে নিজের জন্য তিন দিন কাজ করত, আর পরের তিন দিন তাকে তার প্রভুর জমিদারিতে বাধ্যতামূলকভাবে ও বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হত। এক্ষেত্রে তাই শ্রমের পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অংশ ও পারিশ্রমিকহীন অংশ যুক্তিভাবে স্থান কাল হিসেবে পৃথক করা হয়েছে; তাই আমাদের উদারপন্থীরা মানুষকে বেগার খাটানোর এই বিকট ব্যাপারে নৈতিক ক্রোধে উদ্বেল হয়ে উঠতেন।

একজন মানুষের সপ্তাহে তিন দিন নিজের জন্য নিজের জমিতে ও তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে প্রভুর জমিতে কাজ করা, আর ফ্যাক্টরি বা কারখানায় রোজ ছ'ঘণ্টা নিজের জন্য ও ছ'ঘণ্টা মালিকের জন্য খাটা আসলে এ দুটো কিন্তু **একই** ব্যাপার, যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন অংশ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মেশানো থাকে আর গোটা লেনদেনের চরিত্রটি সম্পূর্ণ গোপন থাকে একটি **চুক্তির মধ্যস্থতা** ও সপ্তাহান্তিক **বেতনের** আড়ালে। পারিশ্রমিকহীন খাটুনি একক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক ও অপরক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বলে বোধ হয়। এইটুকুই যা তফাৎ।

'শ্রমের মূল্য' কথাটা আমি **'শ্রম-শক্তির মূল্যের'** শুধু একটা বহু প্রচলিত, আটপৌরে প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহার করব।

১০। পণ্যকে তার যথা মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা মেলে

ধরুন এক ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছ-পেনি মূল্যের ভিতরে অর্থাৎ বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছ-শিলিং-এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। আরো ধরা যাক, শ্রমের মূল্য হচ্ছে তিন শিলিং অথবা ছ-ঘণ্টার শ্রমের উৎপন্ন। এখন যদি পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে চব্বিশ ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম রূপায়িত হয়ে থাকে তাহলে সে সবের মূল্য হল বারো শিলিং। এর উপরে যদি পুঁজিপতি কর্তৃক নিযুক্ত মজুর উৎপাদনের ঐ সব উপায়ের বারো ঘণ্টার সঙ্গে তার শ্রম যোগ করে, তাহলে ঐ বারো ঘণ্টা আরো ছ-শিলিং মূল্যের মধ্যে রূপ লাভ করবে। **উৎপন্নের সামগ্রিক মূল্য** তাহলে দাঁড়াবে ছত্রিশ ঘণ্টার রূপায়িত শ্রম বা আঠারো শিলিং-এর সমান। কিন্তু মজুরের শ্রমের মূল্য বা মজুরি তিন শিলিং মাত্র হওয়াতে মজুর ছ'ঘণ্টা ধরে যে উদ্বৃত্ত শ্রম করল এবং যে শ্রম পণ্যের মূল্যের মধ্যে রূপ পেল, তার বদলে পুঁজিপতিকে কোনো প্রতিমূল্য দিতে হল না। এই পণ্যটিকে তার যথা মূল্য — আঠারো শিলিং-এ বিক্রি করে পুঁজিপতি তাই তিন শিলিং মূল্য উশুল করবে -- যার বদলে সে প্রতিমূল্য কিছুই দেয় নি। এই তিন শিলিংই হবে বাড়তি মূল্য বা মুনাফা যা যাবে তারই পকেটে। ফলে পুঁজিপতি তিন শিলিং মুনাফা করবে পণ্যটিকে তার মূল্যের চেয়ে **বেশি** দরে বিক্রি করে নয়, তাকে **তার যথার্থ মূল্যে** বিক্রি করেই।

পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার ভিতরে যে **শ্রম** বিধৃত থাকে তার **সমগ্র পরিমাণের** দ্বারাই। কিন্তু শ্রমের ঐ পরিমাণের এক অংশ রূপায়িত হচ্ছে একটি মূল্যের ভিতরে যার তুল্যমূল্য মজুরি রূপে দেওয়া হয়েছে, আর একটি অংশ উশুল হচ্ছে এক মূল্যের ভিতরে যার জন্য **কোনো** তুল্যমূল্য দেওয়া **হয় নি**। পণ্যের ভিতরে যে শ্রম রয়েছে তার এক অংশ হচ্ছে **পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত** শ্রম, আরেক অংশ হচ্ছে **পারিশ্রমিকহীন** শ্রম। কাজেই পণ্যকে **তার মূল্য** অর্থাৎ তার মধ্যে নিবদ্ধ **শ্রমের গোটা পরিমাণের** ঘনীভূত রূপ হিসেবে বিক্রি করে পুঁজিপতি নিশ্চয়ই মুনাফা রেখেই তা বেচতে পারে। যার জন্য পুঁজিপতিকে তুল্যমূল্য দিতে হয়েছে শুধু তাই নয়, যার জন্য তার মজুরকে গতর খাটাতে হলেও নিজেকে কিছুই দিতে হয় নি তাও

সে বিক্রি করে। পণ্যের জন্য পুঁজিপতি যে খরচটা করল ও আসলে যে খরচ হল এ দুটো আলাদা ব্যাপার। তাই আবার বলি, স্বাভাবিক ও গড়পড়তা মুনাফা আসে পণ্যকে তার মূল্যের চাইতে **বেশি** মূল্যে নয়, **তার যথার্থ মূল্যে** বিক্রি করেই।

১১। বিভিন্ন অংশে বাড়তি মূল্যের বাঁটোয়ারা

উদ্বৃত্ত মূল্য, অর্থাৎ সমগ্র পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যার ভিতরে মজুরের উদ্বৃত্ত বা **পারিশ্রমিকহীন শ্রম** রূপ পেয়েছে, তাকেই আমি বলি **মুনাফা।** সেই মুনাফার সবটাই নিয়োগকারী পুঁজিপতির পকেটে যায় না। কৃষি, নির্মাণ, রেলপথ অথবা অন্য যে কোনো উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যেই জমি ব্যবহৃত হোক না কেন, জমির ওপরে একচেটিয়া থাকায় ভূস্বামী **খাজনা** নামে এই **বাড়তি মূল্যের** একাংশ হস্তগত করতে পারে। অন্যদিকে **শ্রমের উপকরণসমূহ** অধিকারে থাকে বলেই নিয়োগকারী পুঁজিপতি **বাড়তি মূল্য** উৎপাদন করতে পারে অর্থাৎ অন্য কথায় **পারিশ্রমিকহীন শ্রমের একটা অংশ আত্মসাৎ করতে** পারে, তাই শ্রমের উপকরণসমূহের যে মালিক নিয়োগকারী পুঁজিপতিকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ঐসব উপকরণ ধার দেয় — অর্থাৎ এক কথায় **মহাজনী পুঁজিপতি — সুদ** নাম দিয়ে ঐ বাড়তি মূল্যের আর এক অংশ নিজের বলে দাবি করতে পারে। ফলে নিছক নিয়োগকারী পুঁজিপতির জন্য যা বাকি থাকে তাকে বলা হয় **শিল্পগত** বা **কারবারী** মুনাফা।

এই তিন ধরনের লোকের মধ্যে গোটা বাড়তি মূল্যের এই ভাগাভাগি কোন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এ প্রশ্ন একেবারেই আমাদের বিষয় বহির্ভূত। তবু যা বলা হয়েছে তার থেকে অন্তত এটুকু বেরিয়ে আসে:

খাজনা, সুদ ও শিল্পগত মুনাফা হচ্ছে পণ্যের **বাড়তি মূল্যের** অথবা **পণ্যের ভিতরে নিবদ্ধ পারিশ্রমিকহীন শ্রমের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম** মাত্র এবং **এই উৎস থেকে, কেবল মাত্র এই উৎস থেকেই একইভাবে** এগুলির **উদ্ভব**। নিছক জমি থেকে বা নিছক **পুঁজি** থেকেই তারা উদ্ভূত নয়। কিন্তু নিয়োগকারী পুঁজিপতি মজুরের কাছ থেকে যে বাড়তি মূল্য আদায় করে

নেয়, তাতেই জমি ও পুঁজির মালিকরা নিজ নিজ ভাগ বসাতে সমর্থ হয় তাদের জমি ও পুঁজির জোরে। মজুরের বাড়তি শ্রম বা পারিশ্রমিকহীন শ্রম থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মূল্য সবটাই সাক্ষাৎ নিয়োগকারী পুঁজিপতির পকেটে গেল কিংবা শেষোক্ত লোকটি খাজনা ও সুদের খাতে তার কিছু অংশ তৃতীয় পক্ষের হাতে দিতে বাধ্য হল -- মজুরের নিজের কাছে এর গুরুত্ব নিতান্তই গৌণ। ধরুন, নিয়োগকারী পুঁজিপতি শুধু তার নিজের পুঁজি ব্যবহার করছে ও সে নিজেই নিজের ভূস্বামী, তাহলে সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্যই যাবে তারই পকেটে।

নিয়োগকারী পুঁজিপতিই মজুরের কাছ থেকে সাক্ষাৎভাবে ঐ বাড়তি মূল্য উশুল করে, তা শেষ পর্যন্ত তার যতটা অংশই সে নিজের হাতে রাখতে পারুক না কেন। সুতরাং নিয়োগকারী পুঁজিপতি ও মজুরি-খাটা শ্রমিকের মধ্যেকার এই সম্পর্কের ওপরেই সমগ্র মজুরি-প্রথা ও গোটা বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা নির্ভর করছে। আমাদের বিতর্কে যে নাগরিকেরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটাকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে এবং নিয়োগকারী পুঁজিপতি ও মজুরের ভিতরকার এই মূল সম্পর্ককে গৌণ প্রশ্ন হিসেবে দেখে তাই ভুল করেছেন, যদিও বর্তমান অবস্থায় দামের বৃদ্ধি ঘটলে তার প্রভাব যে সাক্ষাৎ নিয়োগকারী পুঁজিপতি, ভূস্বামী, মহাজনী পুঁজিপতি এবং, বলতে পারেন, ট্যাক্স আদায়কারীর ওপরেও খুব অসমান মাত্রায় পড়তে পারে, একথা তাঁরা ঠিক বলেছিলেন।

যা বলা হল তার থেকে আর একটি সিদ্ধান্ত এসে পড়ছে।

পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, এক কথায় উৎপাদনের উপায়াদি যতটা ব্যবহৃত হয়েছে ততটার মূল্যেরই সমান, সেটা কোনো **আয় নয়,** তা **শুধু পুঁজির** স্থান পূরণ করে। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও পণ্য-মূল্যের অপর যে অংশটা **হল আয়,** অর্থাৎ যা মজুরি, মুনাফা, খাজনা আর সুদ রূপে খরচ হয়, তা মজুরির মূল্য, খাজনার মূল্য, মুনাফার মূল্য প্রভৃতি দিয়ে **গঠিত হয়** এ কথাটা ভুল। গোড়ায় আমরা মজুরির কথা ছেড়ে দেব এবং শুধু শিল্পগত মুনাফা, সুদ ও খাজনার আলোচনাই করব। আমরা একটু আগেই দেখেছি যে পণ্যের মধ্যে নিবদ্ধ **বাড়তি মূল্য,** অথবা তার মূল্যের সেই অংশ যার মধ্যে বিধৃত হয়েছে **পারিশ্রমিকহীন শ্রম,** তা তিনটি বিভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়। কিন্তু এই তিন উপাদানের স্বতন্ত্র মূল্যের

সমষ্টিই হল সে মূল্য, অথবা তাদের **যোগফলের** দ্বারাই সে মূল্য **গঠিত হয়** — এ কথা বললে পুরোপুরিই সত্যের বিপরীত কথা বলা হবে।

এক ঘণ্টার শ্রম যদি ছ-পেনি মূল্যের ভিতরে রূপ পায়, মজুরের শ্রম-দিবস যদি হয় ১২ ঘণ্টার, এর অর্ধেকটা সময় যদি হয় পারিশ্রমিকহীন শ্রম, তাহলে পণ্যের সঙ্গে ঐ বাড়তি শ্রম যোগ করবে তিন শিলিং পরিমাণ **বাড়তি মূল্য**, অর্থাৎ সেই মূল্য যার বদলে প্রতিমূল্য কিছু দেওয়া হয় নি। তিন শিলিং-এর এই বাড়তি মূল্যই হল সেই **মোট তহবিল** যেটুকু নিয়োগকারী পুঁজিপতি, যে অনুপাতেই হোক না কেন, ভূস্বামী ও মহাজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারে। যে মূল্যটা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে পারে তার সীমা হল এই তিন শিলিং। নিয়োগকারী পুঁজিপতিই পণ্য-মূল্যের সঙ্গে স্বীয় মুনাফা বাবদ খুশিমতো একটা মূল্য যোগ করল আর একটা মূল্য যোগ করা হল ভূস্বামী বাবদ, এবং এই ভাবে চালিয়ে খুশিমতো নির্ধারিত মূল্যগুলির যোগফল হল মোট মূল্য — ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তাই, তিনটি অংশে একটি **নির্দিষ্ট মূল্যের বিভাগকে** তিনটি **স্বাধীন** মূল্যের যোগফল দ্বারা সেই মূল্যটির **গঠন** বলে ভুল করা, এবং এইভাবে যে মোট মূল্য থেকে খাজনা, মুনাফা ও সুদ আসছে তাকে একটা খুশিমতো নির্ধারিত পরিমাণে পরিণত করার প্রচলিত ধারণাটির যুক্তিবিভ্রম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

পুঁজিপতি যে মোট মুনাফা কামাল তা যদি ১০০ পাউণ্ডের সমান হয় তাহলে **অনপেক্ষ** রাশি হিসেবে দেখে এই সংখ্যাকে আমরা বলি **মুনাফার পরিমাণ**। কিন্তু ঐ ১০০ পাউণ্ডের সঙ্গে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে তার অনুপাতের যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এই **আপেক্ষিক** পরিমাণকে আমরা বলি **মুনাফার হার**। স্পষ্টতই এই মুনাফার হার দু-ভাবে প্রকাশ করা চলে।

ধরা যাক, **মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া** পুঁজি হচ্ছে ১০০ পাউন্ড। যে বাড়তি মূল্যের সৃষ্টি হয়েছে তাও ধরুন ১০০ পাউন্ড অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, মজুরের শ্রম-দিবসের অর্ধেকটা **পারিশ্রমিকহীন** শ্রম। এখন ঐ মুনাফাকে যদি আমরা মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজির মূল্য দিয়েই পরিমাপ করি তাহলে আমাদের বলতে হবে যে, **মুনাফার হার** হচ্ছে শতকরা একশ, কারণ যে মূল্য আগাম দেওয়া হয়েছে তা হল একশ আর যে মূল্য পাওয়া গেল তা হল দুইশত ভাগ।

অপর পক্ষে যদি আমরা শুধু **মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজি** নয়, বরং আগাম ঢালা **মোট পুঁজির** কথাই ধরি, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন ৫০০ পাউন্ড, যার মধ্যে ৪০০ পাউন্ড যাচ্ছে কাঁচামাল, মেশিন প্রভৃতির মূল্য বাবদ, তাহলে আমরা বলব যে, **মুনাফার হার** হচ্ছে শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র, কারণ একশ পাউন্ড মুনাফা হল আগাম-দেওয়া **মোট** পুঁজির এক-পঞ্চমাংশ মাত্র।

মুনাফার হার প্রকাশের শুধু প্রথম পদ্ধতিটি থেকেই পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমের প্রকৃত অনুপাত, অর্থাৎ **শ্রম** exploitation-এর (এই ফরাসী শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি নিতে হচ্ছে) যথার্থ মাত্রা আমরা দেখতে পাই। প্রকাশের অন্য পদ্ধতিটিই সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং কোনো বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তা সত্যই উপযোগী। অন্তত মজুরের কাছ থেকে পুঁজিপতি বিনা মজুরির শ্রম কী হারে আদায় করছে তা গোপন রাখার পক্ষে এটা খুবই উপযুক্ত।

বাকি বক্তব্যে আমি বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বাড়তি মূল্য ভাগাভাগির হিসাব না করে পুঁজিপতি যে মোট বাড়তি মূল্য আদায় করে সেই সবখানির জন্যই **মুনাফা** শব্দটি ব্যবহার করব আর **মুনাফার হার** কথাটি ব্যবহারের সময়ে সর্বদাই মুনাফার পরিমাপ করব মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজির মূল্য দিয়েই।

১২। মুনাফা, মজুরি ও দামের সাধারণ সম্পর্ক

একটি পণ্যের মূল্য থেকে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের মূল্যটা বাদ দিন, অর্থাৎ যে মূল্য পণ্যের মধ্যে বিধৃত **অতীতের** শ্রমকে প্রকাশ করে তা বাদ দিন, যেটা বাকি রইল সেটা হল **সর্বশেষে** নিযুক্ত মজুরের যোগ করা শ্রম। ঐ মজুর যদি দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করে, বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম যদি ছয় শিলিং-এর সমান পরিমাণ সোনার মধ্যে ঘনীভূত হয়, তবে এই ছ-শিলিং পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্যই হচ্ছে **একমাত্র** মূল্য যা তার শ্রমের সৃষ্টি। তার শ্রমের সময়ের দ্বারা নির্ধারিত এই নির্দিষ্ট

মূল্যটাই হচ্ছে একমাত্র ভাণ্ডার যার থেকে মজুর ও পুঁজিপতি উভয়েই তাদের নিজের নিজের ভাগ বা পাওনা নিতে পারে —, একমাত্র মূল্য যা বণ্টিত হবে মজুরি ও মুনাফায়। দু-পক্ষের মধ্যে নানা রকম অনুপাতে তা ভাগ করা যায়, কিন্তু তার দ্বারা খাস মূল্যটার যে কোনো বদল হয় না তা স্পষ্টই। একজন শ্রমিকের জায়গায় যদি আপনি সমগ্র শ্রমিক জনসংখ্যাকে ধরেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শ্রম-দিবসের জায়গায় যদি এক কোটি বিশ লক্ষ শ্রম-দিবস নেন, তাহলেও হিসাবে পরিবর্তন হবে না।

যেহেতু এই সীমাবদ্ধ মূল্য, অর্থাৎ যেটুকু মূল্যের পরিমাপ হল মজুরের মোট শ্রম, সেটুকুই শুধু পুঁজিপতি ও মজুর ভাগাভাগি করে নিতে পারে, তাই এক পক্ষ যত বেশি পায়, অন্য পক্ষ পায় তত কম, আর এক পক্ষ যত কম পায় অন্য পক্ষ তত বেশি পায়। পরিমাণটা নির্দিষ্ট থাকলে তার এক অংশ বাড়লে অপর অংশ কমবে যথাযথ অনুপাতে। মজুরির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে মুনাফার পরিবর্তন ঘটবে উল্টো দিকে। মজুরি কমলে মুনাফা বাড়বে আর মজুরি বাড়লে মুনাফা কমবে। আমরা আগে যে রকম ধরেছিলাম সেই হিসাবে মজুর যদি পায় তিন শিলিং, অর্থাৎ সে যে মূল্য সৃষ্টি করেছে তার অর্ধেকের সমান, অথবা তার সমস্ত শ্রম-দিবস যদি হয় অর্ধেক পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত, অর্ধেক পারিশ্রমিকহীন শ্রম নিয়ে গঠিত, তাহলে **মুনাফার হার** হবে শতকরা ১০০, কারণ পুঁজিপতিও পাচ্ছে তিন শিলিং। মজুর যদি পায় মাত্র দু-শিলিং, অর্থাৎ যদি সে সমস্ত দিনের তিনভাগের একভাগ মাত্র খাটে নিজের জন্য, তাহলে পুঁজিপতি পাবে চার শিলিং এবং মুনাফার হার হবে শতকরা ২০০। মজুর যদি পায় চার শিলিং, পুঁজিপতি পাবে মাত্র দু-শিলিং এবং মুনাফার হার কমে দাঁড়াবে শতকরা ৫০। কিন্তু এসব বাড়তি-কমতির কোনো প্রভাব পড়বে না পণ্য-মূল্যের উপরে। সুতরাং মজুরি সাধারণভাবে বাড়লে তার ফলে মুনাফার সাধারণ হার কমবে, কিন্তু মূল্যের উপরে তার কোনো প্রভাব পড়বে না।

শেষ পর্যন্ত বাজার-দর যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে পণ্যের সেই মূল্য যদিও একমাত্র তার ভিতরে বিধৃত শ্রমের মোট পরিমাণ দিয়েই নির্ধারিত হয়, ঐ পরিমাণের মধ্যে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমের ভাগাভাগি দিয়ে,

নয়, তবু তার থেকে এটা মোটেই ধরা চলে না যে, বারো ঘণ্টায় উৎপন্ন একই পণ্য বা নানা পণ্যের মূল্য একরকমই থাকবে। একটা নির্দিষ্ট কালের বা নির্দিষ্ট পরিমাণের শ্রম দ্বারা **কতগুলি** বা কী পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হবে, তা নির্ভর করে নিয়োজিত শ্রমের **উৎপাদন-শক্তির** উপরে, তার **প্রসার** বা দৈর্ঘ্যের উপরে নয়। সুতোকাটুনীর শ্রমের উৎপাদন-শক্তির এক ধরনের মাত্রায় ধরুন বারো ঘণ্টা শ্রমের ফলে একদিনে বারো পাউন্ড সুতো তৈরি হতে পারে, কম মাত্রার উৎপাদন-শক্তিতে হয়ত হবে মাত্র দু-পাউন্ড। যদি তাই বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছয় শিলিং মূল্যে পরিণতি লাভ করে তাহলে একক্ষেত্রে বারো পাউন্ড সুতোর দাম হবে ছয় শিলিং, অন্যক্ষেত্রে দু-পাউন্ডের দামও হবে ছয় শিলিং ; তাই একক্ষেত্রে এক পাউন্ড সুতোর দাম হবে ছয় পেনি, অন্যক্ষেত্রে — তিন শিলিং। দামের এই পার্থক্য ঘটছে যে শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে তার উৎপাদন-শক্তির তারতম্যের দরুন। বেশি উৎপাদন-শক্তির ক্ষেত্রে যেখানে এক ঘণ্টার শ্রম এক পাউন্ড সুতোয় রূপায়িত হবে সেখানে কম উৎপাদন-শক্তির বেলায় ছয় ঘণ্টার শ্রমের পরিণতি হবে সেই এক পাউন্ড সুতো। একক্ষেত্রে মজুরি অপেক্ষাকৃত বেশি ও মুনাফার হার কম হলেও এক পাউন্ড সুতোর দাম হবে মোটে ছয় পেনি, অন্যক্ষেত্রটিতে মজুরি কম ও মুনাফার হার বেশি হলেও তার দাম হবে তিন শিলিং। এ রকমটা হবে তার কারণ এক পাউন্ড সুতোর দাম তার মধ্যে **মোট যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে** তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই **মোট পরিমাণ শ্রমটা** কী **অনুপাতে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন** শ্রমে বিভক্ত তার দ্বারা নয়। তাই চড়া দামের শ্রমে সস্তা এবং সস্তা দামের শ্রমে চড়া দামের পণ্য উৎপন্ন করা যায় এই যে কথাটা আগে বলেছি তার আপাতবিরোধী চেহারাটা আর থাকে না। এই সাধারণ নিয়মটিরই তা অভিব্যক্তি যে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তার মধ্যে নিহিত শ্রম দিয়ে এবং বিধৃত শ্রমের পরিমাণ নির্ভর করে নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির ওপর আর তাই তা শ্রমোৎপাদিকা শক্তির প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়।

১৩। মজুরি-বৃদ্ধি বা মজুরি-হ্রাস প্রতিরোধ প্রচেষ্টার প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত

মজুরি-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অথবা মজুরি-হ্রাসের প্রতিরোধ যে যে ক্ষেত্রে ঘটে তার প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত এবার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যাক।

১। আমরা দেখেছি যে **শ্রম-শক্তির মূল্য** বা আরো চলতি ভাষায় **শ্রমের মূল্য** নির্ধারিত হয় তার আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্য বা তাদের উৎপাদনোপযোগী শ্রম-পরিমাণ দ্বারা। ধরুন কোনো একটি বিশেষ দেশে একজন মজুরের প্রতিদিন গড়ে যেসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি লাগে তার মূল্য যদি তিন শিলিং-এ প্রকাশিত ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান হয় তাহলে মজুরকে প্রতিদিনকার জীবনধারণের সমগ্র পরিমাণ জিনিস তৈরি করতে হলে রোজ খাটতে হবে ছ-ঘণ্টা। পুরো শ্রম-দিবস যদি হয় বারো ঘণ্টা তাহলে পুঁজিপতি তাকে তিন শিলিং দিলেই তার শ্রমের মূল্য দেওয়া হবে। শ্রম-দিবসের অর্ধেক হবে পারিশ্রমিকহীন শ্রম আর মুনাফার হার দাঁড়াবে শতকরা ১০০ ভাগ। এখন ধরা যাক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের ফলে একই পরিমাণ কৃষিজাত সামগ্রী তৈরি করতে বেশি শ্রমের দরকার পড়েছে, যার ফলে প্রতিদিনকার গড়পড়তা আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম তিন শিলিং থেকে চার শিলিং-এ উঠেছে। সেক্ষেত্রে **শ্রমের মূল্য** তিনভাগের একভাগ বা শতকরা ৩৩⅓ ভাগ বাড়বে। তার পুরানো জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরের প্রতিদিনকার জীবনধারণের সমপরিমাণ জিনিসের উৎপাদনে লাগবে শ্রম-দিবসের আট ঘণ্টা। বাড়তি শ্রম তাই ছয় থেকে চার ঘণ্টায় নামবে আর মুনাফার হার নামবে শতকরা ১০০ থেকে ৫০-এ। আর মজুরি-বৃদ্ধির দাবি তুলে মজুর তার **শ্রমের বর্ধিত মূল্যই** শুধু দাবি করবে, যেমন যে কোনো পণ্য বিক্রেতা তার পণ্য তৈরির খরচা বেড়ে গেলে সেই বর্ধিত মূল্যটা পাবার চেষ্টা করে। আবশ্যিক দ্রব্যাদির বর্ধিত মূল্য পোষাবার মতো মজুরি যদি না বাড়ে অথবা যথেষ্ট না বাড়ে তাহলে শ্রমের দাম নেমে যাবে **শ্রমের মূল্যের** নিচে আর অবনতি ঘটবে মজুরের জীবনযাত্রার মানে।

উল্টো দিকেও কিন্তু পরিবর্তন সম্ভব। শ্রমের বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির ফলে একই পরিমাণ গড়পড়তা আবশ্যিক দ্রব্যাদি তিন শিলিং থেকে দু-শিলিং-এ নেমে আসতে পারে অথবা ছ-ঘণ্টার বদলে শ্রম-দিবসের মাত্র চার

ঘণ্টা লাগতে পারে আবশ্যিক দ্রব্যাদির তুল্যমূল্য পুনরুৎপাদনে। মজুরটি আগে তিন শিলিং দিয়ে যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি কিনত এখন দু-শিলিং-এই তাই কিনতে পারবে। বাস্তবিকই **শ্রমের মূল্য** যাবে কমে, কিন্তু সেই হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে আগে যা পাওয়া যেত তার সমপরিমাণ পণ্যই মিলবে। মুনাফা তখন তিন থেকে চার শিলিং-এ উঠবে আর মুনাফার হার চড়বে শতকরা ১০০ ভাগ থেকে ২০০-তে। যদিও মজুরের অনপেক্ষ জীবনযাত্রার মান একই থাকবে তবু পুঁজিপতির তুলনায় তার **আপেক্ষিক মজুরি** ও সেই সঙ্গে তার **আপেক্ষিক সামাজিক স্থান** নেমে যাবে। মজুর যদি এই আপেক্ষিক মজুরি-হ্রাসে বাধা দেয় তাহলে সে শুধু তারই নিজের শ্রমের বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির একটা অংশ পাবার এবং সামাজিক ক্রমবিন্যাসে তার সাবেকী আপেক্ষিক স্থান বজায় রাখবারই চেষ্টা করবে। এইভাবে 'শস্য আইন' বাতিল হওয়ার পর শস্য আইন-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে সগাম্ভীর্যে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ঘোরতরভাবে তা লঙ্ঘন করে ইংরেজ কারখানা মালিকেরা সাধারণভাবে শতকরা দশ ভাগ মজুরি কমিয়ে দেয়। গোড়ার দিকে মজুরদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু যে শতকরা দশ ভাগ খোয়া গিয়েছিল পরে তা আবার ফিরে পাওয়া যায়, কী অবস্থাচক্রের ফলে তা আপাতত আলোচনা করছি না।

২। আবশ্যিক দ্রব্যাদির **মূল্য** ও তার ফলে **শ্রমের মূল্য** একই থাকতে পারে, কিন্তু আগেই **মুদ্রার মূল্যের** যে **অদলবদল** ঘটেছে তার ফলে ঐ সব সামগ্রীর **মুদ্রা-দামে** পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আরো বেশি স্বর্ণগর্ভা খনি আবিষ্কারাদির ফলে ধরুন দু'আউন্স সোনা তৈরী করতে যা শ্রম পড়ছে তা আগে এক আউন্সে যা পড়ত তার চেয়ে বেশি নয়। সোনার **মূল্য** তাহলে অর্ধেক অথবা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে যাবে। অন্য সমস্ত পণ্যের **মূল্য** তখন যেমন তাদের আগেরকার **মুদ্রা-দামের** দ্বিগুণ সংখ্যায় প্রকাশ পাবে, **শ্রমের মূল্যের** বেলায় ঠিক তাই হবে। বারো ঘণ্টার শ্রম আগে যেখানে ছ-শিলিং-এ প্রকাশ পেত এখন সেখানে লাগবে বারো শিলিং। মজুরের মজুরি যদি ছ-শিলিং-এ না উঠে তিন শিলিংই থেকে যায় তাহলে **তার শ্রমের মুদ্রা-দাম তার শ্রম-মূল্যের** মাত্র **অর্ধেকেরই** সমান হয়ে দাঁড়াবে আর তার জীবনযাত্রার মান খুব কমে যাবে। কম-বেশি মাত্রায় এই

ব্যাপারই ঘটবে যদি তার মজুরি বাড়ে, কিন্তু সোনার মূল্য যতটা কমেছে সেই অনুপাতে না বাড়ে। সেক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বা যোগান ও চাহিদা, অথবা মূল্য — এর কোনটির বেলাতেই কোনো অদলবদল হচ্ছে না। ঐ সব মূল্যের আর্থিক নামটুকু ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মজুরের আনুপাতিক মজুরি-বৃদ্ধির জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয় — এই কথা বলাও যা, জিনিসের বদলে নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা তার উচিত এই কথা বলাও তা। সমগ্র অতীত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যখনই ঐ রকম মুদ্রার মূল্য-হ্রাস ঘটে তখনই পুঁজিপতিরা মজুরদের ঠকিয়ে নেবার এই সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য তৈরী থাকে। অর্থনীতিবিদদের একটি মস্ত স্কুল জোর গলায় বলেন যে, নতুন নতুন স্বর্ণাঞ্চল আবিষ্কার, রুপোর খনিগুলিতে উন্নততর পদ্ধতি এবং সস্তা দরে পারা সরবরাহের ফলে দামী ধাতুগুলির মূল্য আবার কমে গিয়েছে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যে সাধারণ ও যুগপৎ মজুরি-বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে তার কারণ এইটে।

৩। এখন পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি যে, শ্রম দিবসের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। শ্রম-দিবসের কিন্তু এমনিতে কোনো চিরন্তন সীমা নেই। পুঁজির নিরবচ্ছিন্ন ঝোঁক হল তাকে শারীরিক ভাবে যতদূর সম্ভব টেনে বাড়ানো, কারণ ততটা পরিমাণেই উদ্বৃত্ত শ্রম ও তার ফলে উদ্ভূত মুনাফা বেড়ে উঠবে। পুঁজি শ্রম-দিবসকে যত দীর্ঘ করতে পারবে অপরের শ্রম সে তত বেশি আত্মসাৎ করবে। সতেরো শতকে ও এমন কি আঠারো শতকের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ কালে ১০ ঘণ্টা শ্রম-দিবসই ছিল সারা ইংলণ্ডের স্বাভাবিক শ্রম-দিবস। আসলে যে যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ মেহনতীজনদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ব্যারনদেরই যুদ্ধ সেই জ্যাকোবিনবিরোধী যুদ্ধের সময় (৩৫) পুঁজির উদ্দাম মরশুম গেছে, পুঁজি সেই সময়ে শ্রম-দিবসকে দশ ঘণ্টা থেকে বারো, চৌদ্দ, আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। ম্যালথাসকে আপনারা নিশ্চয়ই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ বলে কখনোই সন্দেহ করবেন না, তিনি পর্যন্ত ১৮১৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ঘোষণা করেন যে, ব্যাপারটা এই রকম চললে জাতির জীবনমূলেই কুঠারঘাত করা (৩৬) হবে। নব-আবিষ্কৃত যন্ত্র সাধারণভাবে চালু হওয়ার বছর কয়েক আগে, ১৭৬৫ সাল নাগাদ ইংলণ্ডে 'ব্যবসা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ' নামে এক পুস্তিকা বেরোয়। শ্রমিক

শ্রেণীর প্রকাশ্য শত্রু এই বেনামী প্রবন্ধকার* খাটুনির ঘণ্টার সীমা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন সম্পর্কে গলাবাজি করেন। এই অভিসন্ধি সিদ্ধির অন্যান্য উপায়ের মধ্যে তিনি **শ্রম-আগারের** (৩৭) প্রস্তাব করেছেন, যেগুলি তাঁর মতে হওয়া উচিত 'বিভীষিকা-আগার'। আর এই 'বিভীষিকা-আগারের' জন্য তিনি কতটা দীর্ঘ শ্রম-দিবস প্রস্তাব করেছেন? **বারো-ঘণ্টা** — ঠিক সেই ক-ঘণ্টাই ১৮৩২ সালে যাকে পুঁজিপতি, অর্থনীতিবিদ ও মন্ত্রীরা শুধু চলতিই নয়, বারো বছরের নীচের শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বলেই ঘোষণা করেন।

মজুর তার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে গিয়ে — বর্তমান ব্যবস্থায় তাকে তা করতেই হবে — পুঁজিপতির হাতে ঐ শক্তি ব্যবহারের ভার তুলে দেয়, কিন্তু তা দেয় একটা যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে। শ্রম-শক্তির স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির কথা বাদ দিলে বলা যায়, সে তার যে শ্রম-শক্তি বেচে তা বজায় রাখার জন্যই, তাকে নষ্ট করার জন্য নয়। শ্রম-শক্তিকে তার দৈনিক বা সাপ্তাহিক মূল্যে বিক্রয় করার সময়ে এ কথা ধরে নেওয়া হয় যে, একদিনেই বা এক সপ্তাহেই ঐ শ্রম-শক্তিকে দু'দিন অথবা দু'সপ্তাহের অপচয় বা ক্ষয়ক্ষতি সইতে হবে না। ১,০০০ পাউন্ড দামের একটি যন্ত্রের কথা ধরুন। যদি দশ বছরে সেটি পুরো ব্যবহৃত হয়ে যায়, তাহলে যেসব পণ্য উৎপাদনে এটি সাহায্য করে তাদের মূল্যের সঙ্গে যন্ত্রটি বছরে ১০০ পাউন্ড যোগ দেবে। পাঁচ বছরে পুরো ব্যবহৃত হলে সেটি বছরে ২০০ পাউন্ড যোগ দেবে অথবা তার বাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্য হল যে সময়ে সেটি পুরো ব্যবহৃত হয়ে যায় তার বিপরীত অনুপাতে। কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে মজুরের তফাৎ এইখানেই। যন্ত্রপাতি ঠিক যে-হারে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেই অনুপাতে সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। উল্টোদিকে মানুষ যত বাড়তি কাজ করে তার সংখ্যাগত যোগফল থেকে যতটা দেখা যায়, তার থেকে বেশি অনুপাতে সে ক্ষয় পায়।

শ্রম-দিবসকে তার আগের যুক্তিযুক্ত আয়তনের মধ্যে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে, অথবা যেখানে স্বাভাবিক খাটুনির ঘণ্টা আইন বেঁধে নির্দিষ্টকরণ শ্রমিকরা বলবৎ করতে পারছে না সেখানে মজুরি-বৃদ্ধি মারফৎ — শুধু যে বাড়তি সময় খাটতে হচ্ছে সেই অনুপাতে নয়, তার থেকে বেশি অনুপাতে

* হয়ত জ. কানিনহেম। — সম্পাঃ

মজ্মুরি-বৃদ্ধি মারফৎ অতিখাটুনি ঠেকানোর চেষ্টা করে মজুরেরা নিজেদের ও নিজ বংশধরদের প্রতি কর্তব্য পালন করছে মাত্র। তারা শুধু পুঁজির অত্যাচারী জবরদখলের ওপর সীমারোপ করছে মাত্র। সময়ের পরিসরেই ঘটে মানুষের বিকাশ। যে লোকের হাতে খুশিমতো কাটাবার কোনো নিরঙ্কুশ সময় নেই, ঘুম, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি নিতান্ত দৈহিক ধরনের ছেদগুলি ছাড়া যার সমস্ত জীবনই পুঁজিপতির জন্য খাটতে হয়, সে ভারবাহী পশুরও অধম। দেহের দিক থেকে জীর্ণ ও মনের দিক থেকে পশুত্বের স্তরে অধঃপতিত হয়ে সে হয় অপরের সমৃদ্ধি সৃষ্টির একটি যন্ত্র মাত্র। অথচ আধুনিক শিল্পের সমগ্র ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, বাধা না পেলে পুঁজি সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকেই এই চূড়ান্ত অবনতির স্তরে নিয়ে ফেলার জন্য বেপরোয়া ও নির্মমভাবে কাজ করে যাবে।

খাটুনির ঘণ্টা বাড়ানোর সময়ে পুঁজিপতি **উচ্চতর মজুরি** দিয়েও শ্রমের মূল্য কমিয়ে দিতে পারে, যদি যে বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম আদায় করা হচ্ছে ও তার ফলে শ্রম-শক্তির যে দ্রুততর ক্ষয় হচ্ছে তার সঙ্গে সমানুপাতিক মজুরি-বৃদ্ধি না ঘটে। আর এক ভাবে তা করা চলে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া পরিসংখ্যানবিদেরা হয়তো আপনাদের বলবেন যে দৃষ্টান্তস্বরূপ, ল্যাঙ্কাশায়ার কারখানা এলাকার শ্রমিক পরিবারগুলির গড়পড়তা মজুরি বেড়ে গেছে। তাঁরা ভুলে যান যে, একটা লোকের শ্রমের জায়গায় পরিবারের কর্তা পুরুষটি, তার স্ত্রী ও হয়ত তিন-চারটি ছেলেমেয়েও এখন পুঁজির জগন্নাথী রথচক্রে পিষ্ট হচ্ছে এবং পরিবারটি থেকে মোট যে উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় করা হচ্ছে সেটার সঙ্গে মোট মজুরি-বৃদ্ধি তাল রাখে নি।

শিল্পের যেসব শাখা কারখানা-আইনের আওতায় পড়ে সেখানে এমন কি শ্রম-দিবসের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেও শুধু শ্রম-মূল্যের সাবেক মান বজায় রাখার জন্যই মজুরি-বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। শ্রমের **তীব্রতা** বাড়িয়ে আগে দু-ঘণ্টায় যতটা জীবনী শক্তি ব্যয় হত এখন এক ঘণ্টাতেই ততটা ব্যয় করতে একজনকে বাধ্য করা যেতে পারে। কারখানা-আইনের অধীন শিল্পগুলিতে যন্ত্রবেগ বাড়িয়ে ও একজন মনুষ্যকে যেসব কর্মযন্ত্রের তত্ত্বাবধান করতে হয় তার সংখ্যাবৃদ্ধি করে এই ব্যাপারই কিছুটা করা হয়েছে। শ্রমের তীব্রতাবৃদ্ধি অথবা এক ঘণ্টায় যে শ্রম ঢালতে হয় তার পরিমাণ যদি

শ্রম-দিবসের মাত্রাহ্রাসের সঙ্গে কিছুটা ন্যায্য অনুপাতে চলে তাহলেও মজুরেরই জিত। এইমাত্রা পেরোলেই একদিকে সে যা জিতবে অন্যদিকে তাই সে হারাবে এবং সেক্ষেত্রে দশ ঘণ্টার শ্রম আগেকার বারো ঘণ্টার শ্রমের মতোই সর্বনাশা হতে পারে। পুঁজির এই ঝোঁককে ঠেকিয়ে, শ্রমের তীব্রতাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করে মজুর শুধু তার শ্রমের মূল্য-হ্রাসকে এবং তার উত্তরপুরুষের অবনতিকেই প্রতিরোধ করছে।

৪। আপনারা সবাই জানেন যে কতকগুলি কারণের দরুন, যা এখন আমার ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, পুঁজিবাদী উৎপাদন কতকগুলি পর্যায়িক চক্রের ভিতর দিয়ে চলে। নিস্পন্দভাব, ক্রমবর্ধমান তেজীভাব, সমৃদ্ধি, অতি-বাণিজ্য, সঙ্কট ও অচলাবস্থা — এই সব পর্যায়ের ভিতর দিয়েই তা অগ্রসর হয়। পণ্যের বাজার-দর ও মুনাফার বাজার-হার এই সব পর্যায় অনুসরণ করে চলে কখনও তার গড়পড়তা হারের নিচে নেমে যায়, কখনও বা তার ওপরে ওঠে। সমগ্র চক্রটির কথা ধরলে আপনারা দেখবেন যে, বাজার-দরের একটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করছে আর একটি বিচ্যুতি এবং সমগ্র চক্রের গড় ধরলে পণ্যের বাজার-দর তাদের মূল্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পড়তি বাজার-দর, সঙ্কট ও অচলাবস্থার পর্যায়ে মজুরের কাজ যদি বা একেবারেই না যায় তাহলে তার মজুরি অন্তত নিশ্চয়ই কমে যাবে। না ঠকতে হলে বাজার-দরের ঐ রকম হ্রাস সত্ত্বেও কতটা আনুপাতিক হারে মজুরি-হ্রাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছে — এই নিয়ে পুঁজিপতির সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হবে। সমৃদ্ধির পর্যায়ে, যখন বাড়তি মুনাফা কামানো হয় তখন যদি সে মজুরি-বৃদ্ধির লড়াই না করে থাকে, তাহলে একটি শিল্প চক্রের গড়ের হিসাব অনুসারে সে তার **গড়পড়তা মজুরি** বা তার শ্রমের মূল্য পর্যন্তও পাবে না। চক্রের প্রতিকূল পর্যায়গুলিতে তার মজুরি অনিবার্য ভাবে প্রভাবিত হলেও চক্রের সমৃদ্ধ পর্যায়ে উচিত ক্ষতিপূরণের চেষ্টা থেকে তার বিরত থাকার দাবি করা নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত। চাহিদা ও যোগানের অবিশ্রাম উঠতি-পড়তি থেকে উদ্ভূত নিরন্তর পরিবর্তনশীল বাজার-দরের ক্ষতিপূরণ মারফতই কেবল সাধারণত সমস্ত পণ্যের মূল্য হাসিল হয়। বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রম অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই নিছক একটি পণ্য। তাই তাকেও তার মূল্য অনুযায়ী গড়পড়তা দাম পেতে হলে সমান উঠতি-পড়তির ভিতর দিয়ে

যেতে হবে। একদিকে শ্রমকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা আর অন্যদিকে পণ্যের দাম যে-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার আওতা থেকে তাকে বাদ দিতে চাওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিহীন হবে। ক্রীতদাস একটা স্থায়ী ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরণপোষণ পায়, মজুরি-খাটা শ্রমিক তা পায় না। তাকে এক সময়ে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতেই হবে, আর কিছু না হোক শুধু অন্য সময়ের মজুরি-হ্রাস পূরণ করার জন্যই। পুঁজিপতির ইচ্ছা ও হুকুমকে শাশ্বত অর্থনৈতিক নিয়ম হিসেবে মেনে যদি সে হাল ছেড়ে দেয় তবে তার ভাগ্যে ক্রীতদাসের সমস্ত দুর্গতি জুটবে, কিন্তু জুটবে না ক্রীতদাসের ভরণপোষণ।

৫। যতগুলি দৃষ্টান্ত আমি বিবেচনা করলাম, তার সবগুলিতেই (আর একশ-র মধ্যে এগুলিই হচ্ছে নিরানব্বই) আপনারা দেখেছেন যে, মজুরি-বৃদ্ধির সংগ্রাম শুধু **পূর্ববর্তী** পরিবর্তনের পিছু পিছু চলে এবং উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রমের উৎপাদন-শক্তি, শ্রমের মূল্য, মুদ্রার মূল্য, যে শ্রম আদায় করা হচ্ছে তার মাত্রা বা তীব্রতা, চাহিদা ও যোগানের উঠতি-পড়তির ওপরে নির্ভরশীল এবং শিল্পচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাজার-দরের উঠতি-পড়তি — এই সব ক্ষেত্রে আগেই যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, স্বভাবত তার থেকেই তার উদ্ভব। এক কথায়, পুঁজির পূর্বতন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তার উদ্ভব। এই সমস্ত অবস্থা থেকে মজুরি-বৃদ্ধির সংগ্রামকে স্বতন্ত্র করে দেখলে, অন্য যেসব পরিবর্তন থেকে তার উদ্ভব তাকে উপেক্ষা করে শুধু মজুরির পরিবর্তনটুকুই দেখলে, আপনারা ভ্রান্ত পূর্বপ্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করবেন এবং পৌঁছবেন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে।

১৪। পুঁজি ও শ্রমের সংগ্রাম এবং তার ফলাফল

১। মজুরি-হ্রাসের বিরুদ্ধে মজুরদের পর্যায়িক প্রতিরোধ ও মজুরি-বৃদ্ধির জন্য তাদের পর্যায়িক প্রচেষ্টা মজুরি-প্রথারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; শ্রম পণ্য হয়ে ওঠার দরুনই তার উদ্ভব, এবং সেই কারণে দামের সাধারণ গতিবিধি নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলির তা অধীন — এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণভাবে মজুরি-বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফার হার পড়ে যাবে, কিন্তু তার ফলে পণ্যের

গড়পড়তা দাম বা তাদের মূল্য প্রভাবিত হবে না — এও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এখন এই প্রশ্ন ওঠে: পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার এই অবিরাম সংগ্রামে শ্রমের পক্ষে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা কতটুক?

একটা সাধারণসূত্রে আমি এর জবাবে দিতে পারি, বলতে পারি যে, অন্য সব পণ্যের মতো শ্রমের ক্ষেত্রেও তার বাজার-দর শেষ পর্যন্ত তার মূল্যের সঙ্গে মিলবে, সুতরাং সমস্ত উঠতি-পড়তি সত্ত্বেও, যত চেষ্টাই সে করুক না কেন গড়পড়তায় মজুর পাবে শুধু তার শ্রমের মূল্যই অর্থাৎ যা হচ্ছে শ্রম-শক্তির মূল্য এবং যা নির্ধারিত হয় ঐ শ্রম-শক্তি সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাগে তার মূল্যের দ্বারা — সেসব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও আবার শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম লাগে তার দ্বারাই।

কিন্তু শ্রম-শক্তির মূল্য বা শ্রমের মূল্য অন্য সব পণ্যের মূল্য থেকে কতগুলি অদ্ভুত রকমের বৈশিষ্ট্যের ফলে স্বতন্ত্র। শ্রম-শক্তির মূল্য গঠিত হয় দুটি উপাদান নিয়ে — একটি শুধুমাত্র দৈহিক, অন্যটি ঐতিহাসিক বা সামাজিক। তার চূড়ান্ত সীমানা দৈহিক উপাদানের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ নিজেকে জীইয়ে রাখার ও পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য, নিজের শারীরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে একেবারে অপরিহার্য আবশ্যিক দ্রব্যাদি পেতেই হবে। কাজেই ঐ আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যই শ্রমের মূল্যের চূড়ান্ত সীমা নির্দেশ করে। অন্যদিকে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যও কতকগুলি চূড়ান্ত, যদিও অত্যন্ত নমনীয় সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট। মেহনতকারী মানুষের দৈহিক শক্তিই তার চূড়ান্ত সীমারেখা নির্দেশ করে। তার জীবনীশক্তির প্রাত্যহিক ক্ষয় যদি একটা বিশেষ মাত্রা ছাপিয়ে যায়, তাহলে নতুন করে প্রতিদিন আর তা পুনঃপ্রয়োগ করা চলে না। অবশ্য আমি আগেই বলেছি এই সীমারেখা অত্যন্ত নমনীয়। সবল ও দীর্ঘায়ু শ্রমিকরা বংশানুক্রমিকভাবে যেমন শ্রম-বাজারের চাহিদা মেটাতে পারে, দ্রুত বংশ-পরম্পরায় ভগ্নস্বাস্থ্য ও স্বল্পায়ু শ্রমিকরাও তেমনি শ্রম-বাজারের চাহিদা মেটাবে।

শুধুমাত্র এই দৈহিক উপাদান ছাড়াও প্রত্যেক দেশে শ্রমের মূল্য একটি ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রার মানের দ্বারা নির্ধারিত। এ শুধু দেহাশ্রিত

জীবনধারণই নয়, জনসাধারণ যে সামাজিক অবস্থায় রয়েছে ও যার মধ্যে তারা লালিতপালিত হয়েছে, তার থেকে উদ্ভূত কতগুলি প্রয়োজনের পরিতৃপ্তিও চাই। ইংরেজী জীবনযাত্রার মানকে আইরিশদের মানে, জার্মান কৃষকের জীবনযাত্রার মানকে লিভোনিয়ান কৃষকের মানে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এ দিক দিয়ে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও সামাজিক অভ্যাস যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তা আপনারা **মিঃ থর্নটনের 'অতিরিক্ত জনসংখ্যা'** গ্রন্থ থেকে জানতে পারেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভূমিদাস প্রথার কবল থেকে ইংলণ্ডের বিভিন্ন কৃষিপ্রধান জেলাগুলি যেমন যেমন অনুকূল অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে মোটের উপর সেই অনুসারেই এখনও তাদের গড়পড়তা মজুরিতে তারতম্য রয়েছে।

শ্রম-মূল্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপাদানকে বাড়িয়ে, কমিয়ে বা একেবারে নির্মূল করেও দেওয়া যায়; যাতে একমাত্র **দৈহিক সীমা** ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বুড়ো জর্জ রোজ -- সেই ঝানু, ট্যাক্সোখোর ও পরভোজী জর্জ রোজের কথামতো যে জ্যাকোবিনবিরোধী যুদ্ধ চালানো হয়েছিল ফরাসী কাফেরদের হাত থেকে আমাদের পবিত্র ধর্ম রক্ষা করার জন্য, সেই যুদ্ধের আমলে যে সৎ ইংরেজ খামারীদের সম্পর্কে আমাদের আগেকার এক বৈঠকে খুব নরমভাবে বলা হয়েছিল তারা কৃষি-মজুরদের মজুরি একেবারে **ন্যূনতম দৈহিক মাত্রারও** নীচে নামিয়ে দেয় আর মজুরদের দৈহিক বংশরক্ষার জন্য আরো যেটুকু প্রয়োজন তা **'দুঃস্থ আইনের'** ('পুওর ল') (৩৮) সাহায্যে পুষিয়ে দেয়। মজুরি-খাটা শ্রমিককে ক্রীতদাসে আর শেকসপিয়রের সেই দৃপ্ত প্রজাকে নিঃস্বে রূপান্তরিত করার এ এক চমৎকার পন্থা।

বিভিন্ন দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে প্রচলিত মজুরি-মান বা শ্রম-মূল্য তুলনা করলে আপনারা দেখবেন যে, অন্য সমস্ত পণ্যের মূল্য স্থির থাকলেও **শ্রম-মূল্য** ব্যাপারটাই একটা স্থির রাশি নয়, বরঞ্চ পরিবর্তনশীল রাশিই।

একই রকমের তুলনা করে দেখলে প্রমাণ হবে যে মুনাফার **বাজার-হারই** যে শুধু বদলায় তাই নয়, তার **গড়পড়তা** হারও বদলায়।

কিন্তু **মুনাফার** বেলায় তার **ন্যূনতম সীমা** নির্দেশ করে এমন কোনো

নিয়ম নেই। কোন চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত তা যে কমতে পারে তা আমরা বলতে পারি না। কেন আমরা সে সীমা নির্দেশ করতে পারি না? কারণ **ন্যূনতম** মজুরি স্থির করতে পারলেও আমরা তার **সর্বোচ্চ সীমা** নির্ধারণ করতে পারি না। আমরা শুধু বলতে পারি যে, শ্রম-দিবসের সীমা নির্দিষ্ট থাকলে **মজুরির দৈহিক ন্যূনতম মাত্রার** ক্ষেত্রে হবে **মুনাফার সর্বোচ্চ সীমা** আর মজুরি নির্দিষ্ট থাকলে **সর্বোচ্চ মুনাফা** হবে মজুরের দৈহিক শক্তির পক্ষে যতটা সম্ভব শ্রম-দিবস ততটা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। সর্বোচ্চ মুনাফা তাই মজুরির ন্যূনতম দৈহিক মাত্রা ও শ্রম-দিবসের সর্বোচ্চ দৈহিক মাত্রা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই **মুনাফার সর্বোচ্চ হারের** দুই সীমানার মধ্যে যে অসংখ্য রকমের অদলবদল সম্ভব তা সুস্পষ্ট। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন মাত্রায় তা নির্দিষ্ট হয় পুঁজি ও শ্রমের ভিতরে অবিশ্রাম সংগ্রামের মাধ্যমেই। পুঁজিপতি অবিরাম চেষ্টা করে দৈহিক ন্যূনতম মাত্রা অবধি মজুরি কমানো ও দৈহিক সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত শ্রম-দিবস বাড়ানোর জন্য, আর মজুর অনবরত ঠেলা দেয় এর উল্টো দিকে।

ব্যাপারটা প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের পারস্পরিক শক্তির প্রশ্নেই দাঁড়ায়।

২। অন্য সব দেশের মতো ইংলণ্ডেও **শ্রম-দিবস বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটা** কখনো **আইনগত হস্তক্ষেপ** ছাড়া স্থির হয় নি। বাইরে থেকে মজুরেরা অবিশ্রাম চাপ না দিলে ঐ হস্তক্ষেপ কখনো ঘটত না। সে যাই হোক, মজুর ও পুঁজিপতিদের মধ্যে ঘরোয়া ব্যবস্থায় ঐ ফল পাওয়া সম্ভব হত না কখনোই। **সাধারণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের** এই প্রয়োজন থেকেই প্রমাণ হয় যে, তার নিছক অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পুঁজিই হচ্ছে অধিকতর শক্তিশালী পক্ষ।

শ্রম-মূল্যের সীমার ক্ষেত্রে, আসল নিষ্পত্তিটা সব সময়েই নির্ভর করে যোগান ও চাহিদার উপর অর্থাৎ পুঁজির তরফ থেকে শ্রমের চাহিদা ও মজুরদের তরফ থেকে শ্রমের যোগানের ওপর। উপনিবেশের দেশগুলিতে যোগান ও চাহিদার নিয়ম মজুরদের অনুকূলে কাজ করে। এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারের মজুরি রয়েছে। পুঁজি যতই চেষ্টা করুক মজুরি-খাটা শ্রমিক ক্রমাগত স্বাধীন, আত্মনির্ভর কৃষকে পরিণত হওয়ার ফলে শ্রম বাজারের ক্রমাগত শূন্যতা সে রোধ করতে পারে না। মার্কিন জনসাধারণের মস্ত এক অংশের পক্ষে মজুরি-খাটা শ্রমিকের বৃত্তি শুধু একটা উৎক্রমণ

পর্যায়। আজ হোক, কাল হোক এ বৃত্তি তারা পরিত্যাগ করে যাবেই। এই রকম ঔপনিবেশিক অবস্থার সংশোধনের জন্য পিতৃস্থানীয় ব্রিটিশ সরকার কিছুদিনের জন্য তথাকথিত আধুনিক ঔপনিবেশিক তত্ত্ব স্বীকার করে নেন; এই তত্ত্ব অনুযায়ী ঔপনিবেশিক জমিজমার উপরে এক কৃত্রিম চড়া দাম আরোপ করা হয়, যাতে করে মজুরি-খাটা শ্রমিকের স্বাধীন কৃষকে দ্রুতগতি রূপান্তর বন্ধ করা যায়।

কিন্তু এখন আসুন সেই পুরানো সভ্য দেশগুলির ব্যাপারে, পুঁজি যেখানে সমস্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উপরে আধিপত্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইংলণ্ডের কৃষি-মজুরদের মজুরি বৃদ্ধির কথাটাই ধরুন। কী তার ফল দাঁড়িয়েছিল? বন্ধুবর ওয়েস্টন তাদের যে পরামর্শ দিতেন সেই অনুসারে খামারীরা গমের মূল্য, এমন কি তার বাজার-দরও বাড়াতে পারে নি। বরঞ্চ দর-হ্রাসটাকেই তাদের মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এই এগারো বছরে তারা নানা রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, আরো বেশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, কৃষিযোগ্য জমির কিছুটা অংশ রূপান্তর করে চারণ-ভূমিতে, কৃষি খামারের আয়তন এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায় এবং এই ও অন্যান্য সব ব্যবস্থার সাহায্যে তারা শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে শ্রমের চাহিদা কমিয়ে আনে ও কৃষিজীবী জনসংখ্যাকে ফের আপেক্ষিকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তোলে। সাবেকী জন-অধ্যুষিত দেশগুলিতে মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পুঁজির যে দ্রুত বা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া ঘটে, এই হল তার সাধারণ পদ্ধতি। রিকার্ডো ঠিকই বলেছিলেন যে, শ্রমের সঙ্গে যন্ত্র অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা করছে এবং অনেক সময়েই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করা সম্ভব হয় তখনই যখন শ্রমের দাম একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছয় (৩৯) কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োগ হল শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির বহু পদ্ধতির একটি। এই একই যে ঘটনা একদিকে সাধারণ শ্রমকে আপেক্ষিকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তুলছে, তাই আবার অন্যদিকে দক্ষ শ্রমকেও সরল করে তোলে ও এইভাবে তার মূল্য হ্রাস করে।

এই একই নিয়ম কার্যকরী হয় অন্যভাবেও। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চহারের মজুরি সত্ত্বেও পুঁজি সঞ্চয়ের গতি ত্বরান্বিত হবে। কাজেই **অ্যাডাম স্মিথের** মতো, যাঁর সময়ে আধুনিক শিল্প

ছিল শৈশবাবস্থায়, কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন যে, পুঁজির দ্রুততর সঞ্চয় শ্রমের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে মজুরদের অনুকূলেই পাল্লা ঝোঁকাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বহু সমসাময়িক লেখক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন — গত বিশ বছরে ইংরেজ জনসংখ্যার চেয়ে ইংরেজ পুঁজি অত বেশি দ্রুত বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও মজুরি তত বেশি বৃদ্ধি পেল না কেন? কিন্তু সঞ্চয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির সংবিন্যাসেরও একটা ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে। মোট পুঁজির যে-অংশটা গঠিত স্থির পুঁজি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, সমস্ত রকমের উৎপাদনের উপায় দিয়ে, সেই অংশটা পুঁজির অন্য যে-অংশ মজুরির জন্য বা শ্রম ক্রয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় তার তুলনায় উত্তরোত্তর বেশি করে বৃদ্ধি পায়। মিঃ বার্টন, রিকার্ডো, সিসমন্দি, অধ্যাপক রিচার্ড জোনস, অধ্যাপক র‍্যামসি, শের্বুলিয়ে ও অন্যান্যেরা মোটের ওপর সঠিকভাবেই এই নিয়মটিকে বিবৃত করেছেন।

পুঁজির এই দুই উপাদানের অনুপাত যদি গোড়ার দিকে সমান সমান থাকে তাহলে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটা হয়ে দাঁড়াবে অন্যটার পাঁচ গুণ ইত্যাদি। মোট পুঁজি ৬০০-র মধ্যে ৩০০ যদি যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতিতে আর ৩০০ মজুরিতে নিয়োগ করা হয়, তাহলে ৩০০-র জায়গায় ৬০০ মজুরের চাহিদা সৃষ্টির জন্য মোট পুঁজিকে মাত্র দ্বিগুণ করলেই চলে। কিন্তু ৬০০ পুঁজির মধ্যে ৫০০ যদি যন্ত্রপাতি, মালপত্র প্রভৃতিতে যায়, আর মাত্র ১০০ যায় মজুরিতে, তাহলে ৩০০-র জায়গায় ৬০০ মজুরের চাহিদা সৃষ্টি করতে হলে ঐ একই পুঁজিকে ৬০০ থেকে ৩,৬০০-তে বেড়ে উঠতে হবে। শিল্পোন্নতির পথে তাই শ্রমের চাহিদা পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলে না। চাহিদাও বাড়তে থাকবে, কিন্তু পুঁজি-বৃদ্ধির তুলনায় তা বাড়বে ক্রমক্ষীয়মাণ হারে।

আধুনিক শিল্পের বিকাশলাভের ঘটনাটাই যে মজুরের বিপক্ষে আর পুঁজিপতির সপক্ষে উত্তরোত্তর বেশি বেশি করে পাল্লা ভারী করবে আর সেইহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হবে গড়পড়তা মজুরির মান বাড়ানোর দিকে নয়, কমানোর দিকে, অথবা শ্রমের মূল্যকে কমবেশি তার ন্যূনতম সীমায় ঠেলে দেবার দিকেই, তা দেখাবার পক্ষে উপরের কথা কয়টিই যথেষ্ট। এই ব্যবস্থায় ঘটনার প্রবণতা যখন এই দিকে তখন তার অর্থ কি এই যে মজুরদের উচিত পুঁজির জবরদস্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ বন্ধ

করা ও তাদের সাময়িক উন্নতির জন্য কালে-ভদ্রে যে সুযোগ মেলে তার যথাসাধ্য সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া? মজুরেরা যদি তাই করে তাহলে তারা এক উদাসীন হতভাগ্যদলের সমস্তরে নেমে যাবে, মুক্তির কোনো আশা যাদের নেই। মনে হয় আমি দেখাতে পেরেছি যে, মজুরির মানের জন্য তাদের সংগ্রামের ঘটনাগুলি সমগ্র মজুরি-প্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ১০০-র মধ্যে ৯৯ টি ক্ষেত্রেই মজুরি বৃদ্ধির জন্য তাদের সংগ্রামটা হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট শ্রম-মূল্যটা বজায় রাখার চেষ্টামাত্র; আর নিজেদের যে পণ্য হিসেবে বেচতে হয় এই অবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পুঁজিপতির সঙ্গে তাদের শ্রমের দর নিয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজন। পুঁজির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে তারা যদি কাপুরুষের মতো নতিস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই বৃহত্তর কোনো আন্দোলনের উদ্বোধনে তারা নিজেদের অযোগ্য বলেই প্রতিপন্ন করবে।

সেই সঙ্গে মজুরি-প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে মজুরদের দাসত্ব নিহিত রয়েছে তার কথা বাদ দিলেও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিদিনকার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা লড়ছে ফলাফলের সঙ্গে, ঐ ফলাফলের হেতুর সঙ্গে নয়; তারা নিম্ন গতি মন্দীভূত করছে, সে গতির দিক পরিবর্তন করছে না, তারা উপশমের ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে না। সুতরাং পুঁজির অবিরাম আক্রমণ ও বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এই যেসব অনিবার্য গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যেই নিজেদের একান্তভাবে ডুবিয়ে রাখা তাদের উচিত নয়। তাদের বোঝা উচিত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুর্গতিই তাদের উপরে চাপাক না কেন, সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় **বৈষয়িক অবস্থা ও সামাজিক রূপ** সৃষ্টি করছে। **'ন্যায্য শ্রম-দিবসের জন্য ন্যায্য মজুরি!'** — এই **রক্ষণশীল** নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায় এই **বিপ্লবী** মন্ত্র মুদ্রিত করা — **'মজুরি-প্রথার অবসান চাই!'**

আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কিছুটা সুবিচার করার জন্য বাধ্য হয়ে এই অত্যন্ত দীর্ঘ ও হয়তো বা ক্লান্তিকর বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, এখন এই সিদ্ধান্তগুলি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব:

প্রথমত, মজুরি হারের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফা-হার হ্রাস

পায়, কিন্তু মোটের উপর, পণ্যের দামের ওপরে তার কোনো প্রভাব পড়ে না।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে মজুরির গড়পড়তা মান বাড়ানো নয়, তা কমানোর দিকেই।

তৃতীয়ত, পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঘাঁটি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভালো কাজ করে। তাদের আংশিক ব্যর্থতা এইজন্য যে, স্বীয় ক্ষমতা তারা বিবেচকের মতো ব্যবহার করে না। তাদের সাধারণ ব্যর্থতা এইজন্য যে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে একই সঙ্গে পাল্টানোর চেষ্টার বদলে, শ্রমিক শ্রেণীর চরম মুক্তির জন্য অর্থাৎ মজুরি-প্রথার চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য নিজেদের সংগঠিত শক্তিটাকে চালক দণ্ড হিসেবে প্রয়োগ করার বদলে এই ব্যবস্থার ফলাফলের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর মধ্যেই তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে।

১৮৬৫ সালের মে মাসের শেষ দিক থেকে ২৭শে জুন তারিখে মার্কসের লিখিত

স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে সর্বপ্রথম ১৮৯৮ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত

ইংরেজি পুস্তিকার পাঠ অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

বিভিন্ন প্রশ্নে সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট নির্দেশ (৪০)

১। আন্তর্জাতিক সমিতির সংগঠন

সাময়িক নিয়মাবলিতে **সংগঠনের** যে **পরিকল্পনা** নিবদ্ধ হয়েছে, তা সাধারণভাবে ও পুরোপুরি গ্রহণের সুপারিশ করছে সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদ। এই পরিকল্পনার সঠিকতা এবং কর্মের ঐক্যের ক্ষতি না করে বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়েছে দুই বছরের অভিজ্ঞতায়। পরের বছরের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিষ্ঠানস্থান লন্ডনেই রেখে দেবার সুপারিশ করছি কেননা ইউরোপীয় ভূখণ্ডের পরিস্থিতি স্পষ্টতই কোনোরূপে পরিবর্তনের অনুকূল নয়।

বলাই বাহুল্য কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যদের নির্বাচিত হতে হবে কংগ্রেস থেকে (§৫ সাময়িক নিয়মাবলি) অধিগ্রহণের অধিকার সহ।

সমিতির একমাত্র বেতনভোগী পদাধিকারী হিসেবে এক বছরের জন্য **সাধারণ সম্পাদককে** নির্বাচন করা উচিত কংগ্রেস থেকে। আমরা তাকে সপ্তাহে ২ পাউন্ড স্টার্লিং দেবার প্রস্তাব করছি।

সমিতির প্রতিটি সভ্যের সমান হারে বার্ষিক চাঁদা স্থির করা হল **আধ পেনি** (হয়ত এক পেনি)। সভ্য কার্ড (বই)-এর দাম এর অতিরিক্ত।

পারস্পরিক সাহায্যের সমিতি গঠন এবং তাদের ভেতর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমরা সমিতির সভ্যদের আহ্বান করলেও আমরা এ প্রশ্নে (পারস্পরিক সাহায্যের সমিতি গঠন; সমিতির সভ্যদের অনাথ শিশুসন্তানদের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য) উদ্যোগ রেখে দিচ্ছি সুইসদের হাতে যাঁরা গত বছরের সেপ্টেম্বরের সম্মেলনে এই প্রস্তাব এনেছিলেন। (৪১)

২। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংগ্রামে সমিতির সাহায্যে কর্মের আন্তর্জাতিক ঐক্য

ক) সাধারণভাবে বললে এ প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক সমিতির সমগ্র ক্রিয়াকলাপেই পরিব্যাপ্ত, এর লক্ষ্য হল মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের যে শ্রমিক এতদিন পর্যন্ত ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তাকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা সাধারণ খাতে চালিত করা।

খ) একটা যে মূল কাজ আমাদের সমিতি এতদিন পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে সেটা হল পুঁজিপতিদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করা যারা ধর্মঘট ও লক-আউটের ক্ষেত্রে সর্বদা বিদেশী শ্রমিকদের সদিচ্ছার অপব্যবহার করেছে, তাদের কাজে লাগিয়েছে স্থানীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে। সমিতির একটা মহৎ লক্ষ্য হল — বিভিন্ন দেশের শ্রমিকেরা শুধু **অনুভব করে না**, নিজ-মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ ফৌজে সংগ্রামী ভাই ও কমরেড হিসেবে **কাজও করে**, সেটা ঘটানো।

গ) 'কর্মের আন্তর্জাতিক ঐক্যের' বৃহৎ দৃষ্টান্ত হল **সমস্ত দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা বিষয়ে পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা যা শ্রমিক শ্রেণী নিজেরাই চালাবে**। সাফল্যের কিছু আশা নিয়ে কাজ করতে হলে যেসব মালমশলা নিয়ে খাটতে হবে তা জানা চাই। এমন একটা বড়ো কাজে নেমে শ্রমিকেরা দেখিয়ে দেবে যে তারা নিজেদের ভাগ্য স্বহস্তে নিতে সক্ষম। তাই আমরা প্রস্তাব করছি :

আমাদের সমিতির শাখা যেখানে আছে তেমন সকল স্থানেই কাজ শুরু করা হোক এবং সমীক্ষার প্রস্তাবিত ছকে উল্লিখিত বিভিন্ন ধারায় বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা হোক।

শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত সংবাদ সংগ্রহে অংশ নেবার জন্য কংগ্রেস ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত শ্রমিকদের আহ্বান করছে। রিপোর্ট এবং বাস্তব তথ্যাদি কেন্দ্রীয় পরিষদে পাঠানো উচিত। এইসব মালমশলার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ একটি সাধারণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরিশিষ্ট হিসেবে সংখ্যাতথ্যগুলি যোগ করা হবে তাতে।

পরিশিষ্ট সহ প্রতিবেদন পেশ করা হবে পরবর্তী বার্ষিক কংগ্রেসে এবং অনুমোদিত হবার পর তা ছাপা হবে সমিতির টাকায়।

সমীক্ষার সাধারণ ছক,
বলাই বাহুল্য প্রতিটি স্থান হিসেবে
তাতে পরিবর্তন করা যাবে।

১) উৎপাদনের নাম।

২) তাতে নিযুক্ত লোকেদের বয়স এবং স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা।

৩) নিযুক্ত লোকেদের সংখ্যা।

৪) মজুরি: ক) শিক্ষানবিশদের; খ) দৈনিক নাকি ফুরন মজুরি; মধ্যস্থদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ; গড় সাপ্তাহিক, বার্ষিক রোজগার।

৫) ক) কল-কারখানায় শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য। খ) ছোটো ছোটো উদ্যোক্তাদের ওখানে এবং এই ধরনের উৎপাদন থাকলে কুটির শিল্পে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য। গ) দিনের ও রাতের কাজ।

৬) আহারের জন্য বিরতি এবং শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যবহার।

৭) কর্মশালা এবং শ্রমের প্রকৃতির বিবরণ: ঘিঞ্জি জায়গা, বায়ু চলাচল খারাপ, রোদের অপ্রতুলতা, গ্যাস বাতির প্রয়োগ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি।

৮) কাজের প্রকৃতি।

৯) শারীরিক অবস্থার ওপর কাজের প্রভাব।

১০) নৈতিক শর্ত। লালন।

১১) উৎপাদনের অবস্থা। সেটা কি মরশুমী নাকি মোটামুটি সমতালে চলে সারা বছর, বড়ো রকমের ওঠা-নামা হয় কি তাতে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে কি, প্রধানত অভ্যন্তরীণ নাকি বাইরের বাজারের জন্য তা খাটে ইত্যাদি।

৩। শ্রম-দিবস সীমিতকরণ

যে প্রাথমিক শর্ত ছাড়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন ও তাদের মুক্তির সমস্ত পরবর্তী প্রয়াসের নির্বন্ধ অসাফল্য, সেটা হল **শ্রম-দিবস সীমিতকরণ।**

সমস্ত জাতির যারা মেরুদণ্ড সেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তি

পুনরুদ্ধারের জন্য তা যেমন দরকার, তেমনি দরকার শ্রমিকদের মানসিক বিকাশ, নিজেদের বন্ধুর মতো মেলামেশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যও।

আমরা **আইন করে** শ্রম-দিবস **৮ ঘণ্টায় সীমিত করার** প্রস্তাব করছি। এরূপ সীমিতকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের সাধারণ দাবি (৪২), সারা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ কর্মসূচিতে তাকে পরিণত করার জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত।

সমিতির ইউরোপস্থ যেসব সদস্যের ফ্যাক্টরি আইন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত কম, তাদের অবগতির জন্য যোগ করি, শ্রমের এই ৮ ঘণ্টা **দিনের কোন সময়টায়** পড়বে তার যথাযথ উল্লেখ না থাকলে আইন দ্বারা স্থিরীকৃত কোনো সীমিতকরণেই লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না, পুঁজি তা লঙ্ঘন করবে। এই সময়টার দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হওয়া চাই ৮ ঘণ্টায় এবং আহারের জন্য বিরতির অতিরিক্ত সময়ে। যেমন আহারের বিভিন্ন বিরতির জন্য যদি লাগে **এক ঘণ্টা,** তাহলে আইনে ধার্য দিনটা হওয়া উচিত ৯ ঘণ্টা, ধরা যাক সকাল সাতটা থেকে বিকেল ৪টে, অথবা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি, ইত্যাদি। রাতের খাটুনি, উৎপাদনে অথবা উৎপাদনের শাখায় রাতের খাটুনি অনুমোদিত হতে পারবে কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে, আইনের যথাযথ নির্ধারণ অনুসারে। চেষ্টা করা উচিত রাতের খাটুনি পুরোপুরি বরবাদ করার জন্যে।

এই অনুচ্ছেদটি কেবল বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তবে শেষোক্তদের **কোনোরকম রাতের খাটুনি** এবং যেসব শ্রম নারীর অপেক্ষাকৃত পলকা দেহের পক্ষে বিপজ্জনক এবং বিষাক্ত ও অন্যান্য অনিষ্টকর দ্রব্যে তার দেহ আক্রান্ত তাতে তাদের খাটানো চলবে না। বয়স্ক বলতে আমরা বুঝছি ১৮ বছর বয়স হয়েছে এমন সমস্ত লোককে।

৪। শিশু ও নাবালকদের শ্রম (উভয় লিঙ্গের)

আমরা মনে করি যে আধুনিক শিল্পের পক্ষ থেকে উভয় লিঙ্গের শিশু ও নাবালকদের সামাজিক উৎপাদনের বৃহৎ কর্মকাণ্ডে টেনে আনার প্রবণতাটা প্রগতিশীল, সুস্থ ও বৈধ প্রবণতা, যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাও একটা বিকৃত

রূপ নিয়েছে। বিচক্ষণ সামাজিক ব্যবস্থায় ৯ বছর বয়স থেকে **প্রতিটি শিশুকে** হতে হবে উৎপাদক, ঠিক যেমন শ্রমক্ষম প্রতিটি বয়স্ক লোককেও হতে হবে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের অধীন, যথা: খেতে হলে খাটতে হবে এবং খাটতে হবে শুধু মাথা দিয়ে নয়, হাত দিয়েও। তবে বর্তমানে আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে কেবল শ্রমিক শ্রেণীস্থ শিশু ও নাবালকদের জন্য প্রযত্ন।

শারীরবৃত্তের ভিত্তিতে আমরা মনে করি শিশু ও নাবালকদের **তিনটি ভাগে** ভাগ করা প্রয়োজন যা তাদের প্রতি বিভিন্ন সম্পর্কের দাবি করে: প্রথম গ্রুপে থাকা উচিত ৯ থেকে ১২ বছর, দ্বিতীয় গ্রুপে ১৩ থেকে ১৫ বছর, তৃতীয়তে ১৬ ও ১৭ বছর বয়সীরা। আমরা দাবি করি কোনো একটা কর্মশালায় অথবা বাড়িতে প্রথম গ্রুপের জন্য আইন শ্রম সীমিত করুক **দুই** ঘণ্টায়; দ্বিতীয়ের জন্য **চার** এবং তৃতীয়ের জন্য **ছয়** ঘণ্টায়। তৃতীয় গ্রুপের জন্য আহার অথবা বিশ্রামের জন্য অন্তত এক ঘণ্টা বিরতি থাকা চাই।

সম্ভবত প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ে ৯ বছর বয়সের আগেই ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এখানে আমরা কেবল সমাজব্যবস্থার সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে একান্ত অত্যাবশ্যক বিষনাশক ব্যবস্থার কথা বলছি যা শ্রমিককে নামিয়ে দেয় স্রেফ পুঁজি সঞ্চয়ের হাতিয়ারের স্তরে এবং অভাবে জর্জরিত মাতাপিতাকে পরিণত করে নিজেদের শিশুসন্তান বিক্রেতা দাসমালিকে। শিশু ও নাবালকদের **অধিকার** রক্ষা করতে হবে। নিজেরা তারা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হবার মতো অবস্থায় নেই। তাই তাদের পক্ষ নেওয়া সমাজের কর্তব্য। যদি মধ্য উচ্চতর শ্রেণীরা সন্তানদের প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা করে, সেটা তাদের দোষ। এইসব শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা পেলেও শিশুকে তাদের কুসংস্কার থেকে কষ্ট পেতে হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। শ্রমিক তার ক্রিয়াকর্মে স্বাধীন নয়। বড়ো বেশি ক্ষেত্রে সে এতই অজ্ঞ যে নিজের শিশুর সত্যকার স্বার্থ অথবা মানবিক বিকাশের স্বাভাবিক শর্ত বুঝতে সে অক্ষম। সে যাই হোক — সবচেয়ে অগ্রণী শ্রমিকেরা পুরোপুরি বোঝে যে তাদের শ্রেণীর, সুতরাং মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে শ্রমিকদের উঠতি পুরুষদের মানুষ করে তোলার ওপর। তারা বোঝে যে সর্বাগ্রে কর্মরত

শিশু ও নাবালকদের আড়াল করে রাখতে হবে বর্তমান ব্যবস্থার বিধ্বংসী ক্রিয়া থেকে। এটা অর্জিত হতে পারে কেবল **সামাজিক চেতনাকে সামাজিক শক্তিতে** পরিণত করে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তা ঘটানো সম্ভব কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক চালু করা **সাধারণ আইন** মারফত। এরূপ আইন চালু করায় শ্রমিক শ্রেণী মোটেই সরকারের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করছে না। বরং বিপরীত পক্ষে, যে ক্ষমতাটা বর্তমানে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাকে সে পরিণত করবে নিজের হাতিয়ারে, সাধারণ আইন-প্রণয়নী ক্রিয়ার দ্বারা সে তাই ঘটাবে যা অসংখ্য অর্জনের বৃথা চেষ্টা হতে পারত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রয়াসের পথে।

এইটে থেকে এগিয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে মাতাপিতা ও উদ্যোক্তাদের কোনো ক্রমেই শিশু ও নাবালকদের শ্রম নিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া চলবে না যদি তা না মেলানো হয় লালনের সঙ্গে।

লালন বলতে আমরা তিনটি জিনিস বুঝি:

প্রথমত: **মানসিক লালন।**

দ্বিতীয়ত: **শারীরিক লালন** যা পাওয়া যায় ব্যায়ামের বিদ্যালয়ে ও সামরিক কুচকাওয়াজ থেকে।

তৃতীয়ত: **টেকনিকাল শিক্ষা,** যাতে সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে এবং সেই সঙ্গে শিশু ও নাবালক সমস্ত উৎপাদনের সরলতম হাতিয়ারগুলি চালাবার অভ্যাস আয়ত্ত করবে।

মানসিক ও শারীরিক লালন এবং টেকনিকাল শিক্ষার ক্রমশ জটিল কোর্সকে হতে হবে বয়স অনুসারে শিশু ও নাবালকদের গ্রুপে গ্রুপে বণ্টন অনুসারী। টেকনিকাল বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় আংশিক মেটানো উচিত তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় মারফত।

বেতনযোগ্য শ্রম, মানসিক লালন, শারীরিক অনুশীলন এবং পলিটেকনিকাল শিক্ষাকে মেলালে তা শ্রমিক শ্রেণীকে তুলে দেবে অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মানের অনেক ওপরে।

বলাই বাহুল্য, ৯ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত (১৭ সমেত) সকলের শ্রম রাত্রে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সমস্ত উৎপাদনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে আইন দ্বারা।

৫। সমবায়ী শ্রম

শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সমিতি শ্রমিক শ্রেণীর **স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে** ঐক্যবদ্ধ এবং সাধারণ খাতে চালিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে, কিন্তু মোটেই হুকুম জারি করা বা তাদের ওপর কোনো একটা মতবাগীশ ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার লক্ষ্য নয়। সেইজন্য সমবায়ের কোনো একটা **বিশেষ ব্যবস্থা** ঘোষণা করা কংগ্রেসের উচিত নয়, শুধু কতকগুলি সাধারণ নীতির উল্লেখে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

ক) আমরা মনে করি, সমবায় আন্দোলন শ্রেণী বৈরের ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজ পুনর্গঠনের অন্যতম শক্তি। এ আন্দোলনের একটি বড়ো কীর্তি হল এই যে তা কার্যক্ষেত্রে **স্বাধীন ও সমাধিকারী উৎপাদকদের সমিতিস্বরূপ** প্রজাতান্ত্রিক ও লোকহিতকর ব্যবস্থা দ্বারা পুঁজির নিকট শ্রমের **অধীনতার** যে ব্যবস্থাটা স্বেচ্ছাচারী এবং নিঃস্বতার সৃষ্টি করছে, তার স্থানগ্রহণ সম্ভব।

খ) তবে মজুরি শ্রমের পৃথক পৃথক দাসেরা তাদের নিজেদের প্রয়াসে শুধু যেটুকু গড়তে সক্ষম, তেমন বামনাকার রূপে সীমাবদ্ধ থাকায় সমবায় ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে না। সামাজিক উৎপাদনকে স্বাধীন সমবায়ী শ্রমের একটি একক, প্রসারিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত করার জন্য আবশ্যক **সার্বিক সামাজিক পরিবর্তন, সমাজব্যবস্থার বনিয়াদের পরিবর্তন,** যা অর্জিত হতে পারে পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের কাছ থেকে খোদ উৎপাদকদের নিকট সমাজের সংগঠিত শক্তির অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তরে।

গ) **সমবায় ব্যবসার** চেয়ে **সমবায় উৎপাদন** বাঞ্ছনীয় গণ্য করার জন্য শ্রমিকদের কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রথমোক্তটা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শুধু উপরিভাগটা স্পর্শ করে, শেষোক্তটা তার বনিয়াদ বিদীর্ণ করে দেয়।

ঘ) সাধারণ আয়ের একাংশ যেমন কথায় তেমনি কাজে নিজেদের নীতিগুলির প্রচারের তহবিলে যথা, নিজেদের মতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উৎপাদনী-সমবায়ী সমিতি স্থাপনে সহায়তা করার তহবিলে পরিণত করার জন্য সমবায় সমিতিগুলির নিকট সুপারিশ করা হচ্ছে।

ঙ) সাধারণ বুর্জোয়া শেয়ার কোম্পানিতে [sociétés par actions] সমবায় সমিতিগুলির অধঃপতন পরিহারের জন্য প্রতিটি উদ্যোগের শ্রমিকের তার শেয়ার-হোল্ডার হোক বা না হোক, তা নির্বিশেষে আয়ের সমান ভাগ পাওয়া উচিত। নিছক সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে শেয়ার-হোল্ডাররা যদি সামান্য সুদ পায়, তাতে আমরা সম্মত।

৬। ট্রেড-ইউনিয়ন। তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ক) তাদের অতীত।

পুঁজি হল পুঞ্জীভূত সামাজিক শক্তি যেক্ষেত্রে শ্রমিক শুধু শ্রম-শক্তির অধিকারী। সুতরাং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে চুক্তি কখনোই হতে পারে না ন্যায্য ভিত্তিতে, এমন কি যে সমাজে জীবনধারণ ও শ্রমের বাস্তব উপায় জীবন্ত উৎপাদন-শক্তির বিরোধী তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ন্যায্য। শ্রমিকদের সামাজিক শক্তি নিহিত কেবল তাদের সংখ্যায়। কিন্তু সংখ্যায় শ্রেষ্ঠতার শক্তি ধ্বংস পায় তাদের ঐক্যহীনতায়। শ্রমিকদের ঐক্যহীনতা গড়ে ওঠে ও টিকে থাকে তাদের নিজেদের মধ্যেই অনিবার্য প্রতিযোগিতার ফলে।

অন্তত সাধারণ দাসের অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেবে, চুক্তিতে এরূপ শর্ত আদায়ের জন্য এই প্রতিযোগিতা দূর করা অথবা নিদেন পক্ষে হ্রাস করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস থেকে প্রথমে উদ্ভব হয় ট্রেড-ইউনিয়নগুলির। তাই ট্রেড-ইউনিয়নগুলির অব্যবহিত কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজনে, পুঁজির অবিরাম আক্রমণ থামাবার প্রয়াসে, এক কথায় — মজুরি ও শ্রম-সময়ের প্রশ্নে। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির এরূপ ক্রিয়াকলাপ শুধু আইনসঙ্গত নয় আবশ্যিকও। যতদিন উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতি টিকে থাকছে, ততদিন তা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। শুধু তাই নয়, সমস্ত দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন গড়ে ও ঐক্যবদ্ধ করে এই ক্রিয়াকলাপের সার্বিক প্রসার হওয়া উচিত। অন্যদিকে নিজেদের অজ্ঞাতেই ট্রেড-ইউনিয়নগুলি হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সাংগঠনিক কেন্দ্র, ঠিক মধ্য যুগের মিউনিসিপ্যালিটি ও কমিউনগুলি যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়ার কাছে সাংগঠনিক কেন্দ্র। ট্রেড-ইউনিয়ন যদি

প্রয়োজনীয় হয় পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের লড়াইয়ের জন্য, তাহলে **খোদ মজুরি প্রথাটাকেই ও পুঁজির ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য সংগঠিত শক্তি** হিসেবে তা আরো বেশি দরকার।

খ) তাদের বর্তমান।

পুঁজির সঙ্গে একান্তরূপে স্থানিক ও অব্যবহিত সংগ্রামে বড়ো বেশি ঘন ঘন লিপ্ত থাকায় ট্রেড-ইউনিয়নগুলি খোদ মজুরি দাসত্বের ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধেই সংগ্রামে কী শক্তি ধরে সে বিষয়ে এখনো তারা পুরো সচেতন হয়ে ওঠে নি। সেইজন্য সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তারা বড়ো বেশি দূরে সরে থেকেছে। তাহলেও ইদানীং তাদের ভেতর তাদের মহান ঐতিহাসিক ব্রতের চেতনা জেগে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডে বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ তার সাক্ষ্য (৪৩), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নিজেদের কাজের ব্যাপকতর বোধ রয়েছে (৪৪) এবং শেফিল্ডে (৪৫) ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বৃহৎ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত:

"বর্তমান সম্মেলন সমস্ত দেশের শ্রমিকদের একক ভ্রাতৃসঙ্ঘে মিলিত করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সমিতির ক্রিয়াকলাপের উচিতমতো মূল্যায়ন করে এই সমিতিতে প্রবেশের জন্য এখানে বিভিন্ন যেসব সঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে তাদের কাছে সনির্বন্ধ সুপারিশ করছে এবং এইটে ধরে নিচ্ছে যে সেটা সমগ্র শ্রমিক মানুষের অগ্রগতি ও প্রস্ফুরণে রীতিমতো সহায়তা করবে।"

গ) তাদের ভবিষ্যৎ।

নিজেদের প্রাথমিক লক্ষ্য যাই থাকুক, এখন এগুলিকে শ্রমিক শ্রেণীর **পূর্ণ মুক্তির** মহাকর্তব্য নিয়ে তাদের সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসেবে সচেতনভাবে কাজ করা শিখতে হবে। সর্ববিধ যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই অভিমুখে চলেছে তাকে সমর্থন করতে হবে তাদের। সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থের জন্য সংগ্রামী বলে নিজেদের গণ্য করে এবং কার্যক্ষেত্রে তদনুসারে কাজ চালিয়ে তারা নিজেদের পঙক্তিতে অসংগঠিত শ্রমিকদেরও টানতে বাধ্য। উৎপাদনের যেসব শাখার শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সবচেয়ে খারাপ, যেমন কৃষি-মজুর, প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন যারা একেবারে

অসহায়, তাদের স্বার্থের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া তাদের উচিত। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির উচিত সারা বিশ্বকে এইটে দেখানো যে তারা লড়ছে সংকীর্ণ আত্মপরায়ণ স্বার্থের জন্য নয়, কোটি কোটি নিপীড়িতের মুক্তির জন্য।

৭। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর

ক) করধার্যের ধরনে কোনো পরিবর্তনেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কে কোনো মৌলিক রকমের পরিবর্তন ঘটতে পারে না।

খ) তাহলেও করধার্যের এই দুই ধরনের ব্যবস্থা মধ্যে বাছাই করতে হলে আমরা **পরোক্ষ কর পুরোপুরি নাকচ করে তৎস্থলে সর্বত প্রত্যক্ষ করের** সুপারিশ করব।

কারণ, পরোক্ষ কর পণ্যের দর বাড়িয়ে দেয়, কেননা ব্যবসায়ীরা এই দরের ওপর শুধু পরোক্ষ করের পরিমাণটুকু নয়, তা পরিশোধের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম পুঁজির সুদ ও মুনাফাও যোগ করে।

কারণ, পরোক্ষ কর আলাদা প্রত্যেকটি লোকের কাছ থেকে চেপে রাখে রাষ্ট্রকে কতটা তারা দিচ্ছে, যেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর কোনো ছদ্মবেশ না নিয়ে সেটা আদায় করে খোলাখুলি, সবচেয়ে তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিকেও তা বিভ্রান্ত করে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রবুদ্ধ করে সবাইকে যেক্ষেত্রে পরোক্ষ কর আত্মনিয়ন্ত্রণের সর্ববিধ প্রয়াসকে দমন করে।

৮। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট

এ বিষয়ে উদ্যোগ দেওয়া উচিত ফরাসীদের।

৯। পোলীয় প্রশ্ন

ক) ইউরোপীয় শ্রমিক কেন এই প্রশ্নটা তুলছে? প্রথমত, তার কারণ ইউরোপীয় লেখক ও আন্দোলকেরা এ ব্যাপারে চুপ করে থাকার চক্রান্ত করেছে যদিও তারাই ইউরোপীয় ভূখন্ডের সমস্ত জাতির পৃষ্ঠপোষক এমনকি

আয়র্ল্যান্ডেরও। এই নীরবতার কারণ কী? কারণ এই যে, তমসাচ্ছন্ন যে এশীয় শক্তি রয়েছে গৌণ অবস্থানে, অভিজাত এবং বুর্জোয়া উভয়েই তাকে দেখছে শ্রমিক আন্দোলনের উদীয়মান তরঙ্গের বিরুদ্ধে শেষ দুর্গ হিসেবে। এই শক্তিটা সত্যসত্যই চূর্ণ হতে পারে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পোল্যান্ডের পুনর্গঠনের পথে।

খ) মধ্য ইউরোপের, বিশেষত জার্মানির অবস্থার বর্তমান পরিবর্তনে গণতান্ত্রিক পোল্যান্ডের অস্তিত্ব এখন যতটা প্রয়োজন তেমন আর কখনো হয় নি। তা ছাড়া জার্মানি পরিণত হবে পবিত্র-জোটের (৪৬) অগ্রঘাঁটিতে, আর তা থাকলে জার্মানি যোগ দেবে প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায়। এই গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন সর্বদা প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হবে, পরাজয় বরণ করবে এবং তার বিকাশ আটকে থাকবে।

গ) এই প্রশ্নে উদ্যোগ নেওয়াটা জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য, কেননা জার্মানি হল পোল্যান্ড ভাগবিভাগের অন্যতম অংশী।

১০। ফৌজ

ক) **উৎপাদনের** ওপর বড়ো বড়ো স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর সর্বনাশা প্রভাব যথেষ্ট প্রদর্শিত হয়েছে নানা নামের বুর্জোয়া কংগ্রেসে, শান্তিকামী, অর্থনৈতিক, পরিসংখ্যানমূলক, লোকহিতৈষী ও সমাজবিদ কংগ্রেসে। তাই আমরা এ প্রশ্নের বিস্তারণ একেবারে বাহুল্য মনে করি।

খ) আমরা জনগণের সার্বিক সশস্ত্রীকরণ ও সার্বিক অস্ত্রশিক্ষার প্রস্তাব করছি।

গ) সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে আমরা অনতিবৃহৎ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী অনুমোদন করছি, যা হবে মিলিসিয়ার নায়কবৃন্দকে তালিম দেবার বিদ্যালয়; প্রতিটি পুরুষ অতি অল্প সময়ের জন্য এই ফৌজে যোগ দেবে।

১১। ধর্মের প্রশ্ন

এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ফরাসীদের।

১৮৬৬ সালের অগস্টের শেষে মার্কস এটি লেখেন।

প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি 'The International Courier' পত্রিকার ৬-৭ নং সংখ্যায়, ১৩ মার্চ ৮-১০ নং সংখ্যায়; ১৮৬৭ সালের ৯ ও ১৬ মার্চ 'Le Courrier international' পত্রিকার ১০ ও ১১ নং সংখ্যায় এবং ১৮৬৬ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে 'Der Vorbote' পত্রিকার ১০ ও ১১ নং সংখ্যায়

'The International Courier' পত্রিকার ভাষ্য অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নিকট অভিভাষণ (৪৭)

কমরেড শ্রমিকগণ!

আমাদের সমিতির প্রতিষ্ঠা কর্মসূচিতে আমরা ঘোষণা করেছিলাম: 'আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে দাসত্বকে কায়েম রাখার ও প্রচারিত করার কলঙ্কময় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে পশ্চিম ইউরোপকে বাঁচিয়েছিল শাসক শ্রেণীর বিজ্ঞ মনোভাব নয়, বাঁচিয়েছিল সেই অপরাধসূচক মূর্খামির বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীরই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ।'* এবার আপনাদের পালা এসেছে এমন একটা যুদ্ধ ঠেকানো যার ফলে আটলাণ্টিকের উভয় পারে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আন্দোলন নিঃসন্দেহেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হবে।

আপনাদের এ কথা বোঝাবার বড়ো একটা প্রয়োজন নেই যে এমন কিছু রাষ্ট্রশক্তি আছে যারা ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনতে উদগ্ররূপে অভিলাষী। বাণিজ্য পরিসংখ্যানের তথ্যে চোখ বুলালেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে গৃহযুদ্ধ হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত রুশী কাঁচামালের রপ্তানি -- এবং রাশিয়া থেকে রপ্তানির আর কিছু নেই - দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছিল আমেরিকান রপ্তানির কাছে। ঠিক এখনই আমেরিকান লাঙলকে পিটিয়ে খড়্গ করতে পারলেই দেউলিয়াপনার বিপদ থেকে পরিত্রাণ সূচিত হবে এই স্বেচ্ছাচারী শক্তিটির যাকে আপনাদের অতিপ্রাজ্ঞ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুরুষেরা নিজেদের নিকটতম উপদেষ্টা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কোনো না কোনো সরকারের বিশেষ স্বার্থ নির্বিশেষে আমাদের অধিকতর

---

* বর্তমান খণ্ডের ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। -- সম্পাঃ

পরাক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে অন্তর্যুদ্ধে পরিণত করা কি আমাদের উৎপীড়কদের সাধারণ স্বার্থ নয়?

পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষে মিঃ লিঙ্কনকে যে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলাম তাতে আমরা এই প্রত্যয় প্রকাশ করেছিলাম যে বুর্জোয়ার বিকাশের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য আমেরিকান যুদ্ধ যে তাৎপর্য ধরেছিল, শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের পক্ষে আমেরিকার গৃহযুদ্ধও তেমনি বিপুল তাৎপর্য ধরে।* এবং প্রকৃতপক্ষেই দাস-মালিকানার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিজয়ী সমাপ্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসে নবযুগের উদ্বোধন হয়েছে। ঠিক এই সময় থেকেই খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলন, যেটাকে আপনাদের পুরনো পার্টিরা আর তাদের পেশাদার রাজনীতিকেরা দেখছে বিদ্বেষের চোখে। এই আন্দোলনকে পরিপক্ক হবার অবকাশ দিতে হলে দরকার বছরের পর বছর শান্তি। তাকে ধ্বংস করতে হলে দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ।

গৃহযুদ্ধের সরাসরি দৃষ্টিগোচর ফল হয়েছে স্বভাবতই আমেরিকান শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেমন ইউরোপেও, পৈশাচিক রক্তচোষা বাদুড় — জাতীয় ঋণ — স্কন্ধ থেকে স্কন্ধে স্থানান্তরিত হয়ে অবশেষে বর্তেছে শ্রমিক শ্রেণীর ঘাড়ে। আপনাদের একজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বলছেন — প্রাথমিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদির দাম ১৮৬০ সাল থেকে বেড়ে উঠেছে ৭৮%, যেক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে মাত্র ৫০%, দক্ষদের — ৬০%।

. উনি অভিযোগ করেছেন, 'আমেরিকায় এখন নিঃস্বতা বাড়ছে জনসংখ্যার চেয়ে বেশি।'

তদুপরি শ্রমিক শ্রেণীর ক্লেশভোগের প্রেক্ষাপটে আরো প্রকট হয়ে ওঠে ফিনান্স অভিজাত, ভুঁইফোড় অভিজাত (৪৮), এবং যুদ্ধে সম্ভূত অন্যান্য পরজীবীদের দৃষ্টিকটু বিলাস। এবং তাহলেও এসব সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধের ফল হয়েছে ইতিবাচক — দাসেদের মুক্তি এবং তাতে করে নৈতিক প্রেরণা

---

* বর্তমান খণ্ডের ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পেয়েছে আপনাদের নিজেদের শ্রেণী আন্দোলন। কোনো নৈতিক আদর্শ, মহতী সামাজিক আবশ্যিকতা, কোনো কিছুতেই যা ন্যায়সঙ্গত নয়, পুরনো দুনিয়ার মনোভাবে এমন একটা নতুন যুদ্ধের ফল হবে বন্দীদের শৃঙ্খলমোচন নয়, স্বাধীন শ্রমিকদের জন্য নতুন শেকল। এতে যে নিঃস্বতাবৃদ্ধি ঘটবে তাতে স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর হৃদয়হীন খড়্গাঘাতে শ্রমিক শ্রেণীর সাহসী ও ন্যায্য প্রয়াস থেকে তাদের বিচ্যুত করার জন্য আপনাদের পুঁজিপতিরা অজুহাত এবং উপায়, দুই-ই পাবে।

ঠিক এইজন্যই আপনাদের ওপর বর্তাচ্ছে বিশ্বকে এইটে দেখানোর দায়িত্ব যে অবশেষে এখন ইতিহাসের মল্লভূমিতে শ্রমিক শ্রেণী অবতীর্ণ হচ্ছে বশংবদ আজ্ঞানির্বাহী হিসেবে নয়, স্বাধীন শক্তি হিশেবে, যা নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তথাকথিত কর্তারা যেখানে যুদ্ধের চিৎকার তুলছে, সেখানে শান্তির হুকুম জারি করতে তা সক্ষম।

লন্ডন, ১২ মে, ১৮৬৯

'Address to the National Labour Union of the United States' নামক প্রচারপত্র হিসেবে মুদ্রিত, লন্ডন, ১৮৬৯

প্রচারপত্রের ভাষ্য অনুসারে অনূদিত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধ (৪৯)

১৮৭০ সালের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালে, সদ্যসমাপিত প্রতিবিপ্লবের ছাপ যখন তখনো তাজা, সেসময় লন্ডনে নিম্নলিখিত লেখাটি রচিত হয়েছিল; প্রকাশিত হয়েছিল কার্ল মার্কস সম্পাদিত 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue' (৫০) পত্রিকার পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায়, ১৮৫০ সালে, হামবুর্গে। জার্মানিস্থ আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের ইচ্ছা যে এটি পুনর্মুদ্রিত হোক। খুবই খেদের ব্যাপার যে লেখাটি আজও সময়োপযোগী; তাই তাঁদের ইচ্ছা আমি মেনে নিলাম।

নিজস্ব গবেষণা থেকে সঙ্কলিত মালমশলা সরবরাহের কোনো দাবি এ লেখা করে না। বরং, কৃষক অভ্যুত্থানগুলো ও টমাস মুনৎসার সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সমস্তটাই নেওয়া হয়েছে ত্সিমেরমানের কাছ থেকে (৫১)। জায়গায় জায়গায় কিছু ফাঁক থাকলেও তথ্যের দিক থেকে তাঁর বইটি এখনো সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাছাড়া, বুড়ো ত্সিমেরমান তাঁর আলোচ্য বিষয়টি খুবই পছন্দ করতেন। যে বিপ্লবী প্রবৃত্তি তাঁকে এখানে সর্বত্র অত্যাচারিত শ্রেণীর সমর্থক করে তুলেছে, তারই ফলে পরে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টে চরম বামপন্থীদের (৫২) শ্রেষ্ঠ একজন হয়ে দাঁড়ান।

তবুও যদি ত্সিমেরমানের উপস্থাপিত বক্তব্যে অন্তর্নিহিত পারস্পারিক যোগাযোগগুলির অভাব থাকে; যদি তাঁর লেখা সে যুগের ধর্মীয় রাজনৈতিক বিতর্কগুলিকে সমসাময়িক শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিবিম্ব হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে না পেরে থাকে; যদি এই শ্রেণী-সংগ্রামে শুধু অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, ভাল লোক ও খারাপ লোক এবং খারাপ লোকদের চূড়ান্ত বিজয়ই দেখানো থাকে;

যে সামাজিক অবস্থা সে সংগ্রামের উদ্ভব ও পরিণতি নির্ধারণ করেছিল সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যদি খুবই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে সে সব হল যে যুগে এই বইটি লেখা হয় তারই দোষ। বরং সে যুগের তুলনায় বইখানি লেখা হয়েছিল খুবই বাস্তবানুভাবে, ইতিহাস সম্পর্কে জার্মান ভাববাদীদের রচনার মধ্যে এটি একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম।

আমি বক্তব্যের মধ্যে, এই সংগ্রামের ঘটনাস্রোতের শুধু সামান্য রূপরেখাটুকু দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি কৃষকযুদ্ধের উৎপত্তির কারণ: এতে যে বিভিন্ন দল অংশ নিয়েছিল তাদের অবস্থান; যেসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের সাহায্যে এই দলগুলি নিজেদের অবস্থান উপলব্ধি করতে চেয়েছিল সেই সব মতবাদ; এবং সর্বশেষে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির সামাজিক জীবনের ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই সংগ্রামের ফলাফল; অর্থাৎ দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, সে যুগের জার্মানির রাজনৈতিক কাঠামো, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলো এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদসমূহ জার্মানির কৃষি, শিল্প, স্থলপথ ও জলপথ, পণ্যদ্রব্য ও অর্থ ব্যবসায়ের বিকাশের তৎকালীন স্তরটার ফল মাত্র, কারণ নয়। ইতিহাসের এই যে একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, এর স্রষ্টা আমি নই, মার্কস। ঐ আলোচনীতে, ১৮৪৮-৪৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে* তাঁর যে লেখা বেরিয়েছিল তাতে এবং 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে** এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

১৫২৫ সালের জার্মান বিপ্লবের সঙ্গে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের মিল এত স্পষ্ট যে সে সময়ে তাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা চলত না। তবু বিভিন্ন স্থানীয় বিদ্রোহ একই রাজকীয় বাহিনীর হাতে একের পর এক যে দমিত হল, ঘটনাবলীর এই সমতা সত্ত্বেও, উভয় ক্ষেত্রে পৌরজনের [city burghers] ব্যবহারে অনেক সময় হাস্যকর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, পার্থক্যটাও পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট।

---

* ক. মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' (এই সংস্করণের ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

'১৫২৫ সালের বিপ্লবে কার লাভ হয়েছিল? **রাজাদের।** ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে কার লাভ হল? **বড়** রাজাদের, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার। ১৫২৫ সালে ছোট রাজাদের পিছনে ছিল ক্ষুদে পৌরজন, — করের শৃঙ্খলে নিজেদের সঙ্গে এরা তাদের বেঁধে রেখেছিল। ১৮৫০ সালে বড় রাজাদের পিছনে, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পিছনে রয়েছে আধুনিক বৃহৎ বুর্জোয়া — রাষ্ট্রঋণের মাধ্যমে এরা তাদের দ্রুত নিজের অধীনে আনছে। আবার বৃহৎ বুর্জোয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী।'*

দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই অনুচ্ছেদে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি বড় বেশী সম্মান দেখানো হয়েছিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুই দেশেই এই শ্রেণী 'রাষ্ট্রঋণের মাধ্যমে' রাজতন্ত্রকে 'দ্রুত নিজের অধীনে আনার' সুযোগ পেয়েছিল; কোথাও আর কখনো সে এই সুযোগকে কাজে লাগায় নি।

১৮৬৬ সালের যুদ্ধের ফলে (৫৩) ভাগ্যের দানের মতো বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এসে পড়েছিল অস্ট্রিয়া। কিন্তু এ বুর্জোয়ারা শাসন করতে জানে না, তারা শক্তিহীন, কোনো কিছু করতেই অক্ষম। শুধু একটা কাজই তারা করতে পারে: শ্রমিকেরা চঞ্চল হতে শুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বর্বরভাবে আক্রমণ। **হাঙ্গেরীয়দের** প্রয়োজন ছিল বলেই শুধু এই শ্রেণী নেতৃত্বে থেকে গেছে।

আর প্রাশিয়াতে? সত্য বটে রাষ্ট্রঋণ লাফ দিয়ে বেড়ে গেছে, ঘাটতি একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাষ্ট্রীয় ব্যয় বছরে বছরে বেড়ে চলেছে, কক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, আর তাদের সম্মতি ব্যতীত করও বাড়ানো চলে না বা নূতন ঋণও ছাড়া যায় না — কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাদের ক্ষমতা কোথায়? মাত্র কয়েক মাস আগে যখন আবার ঘাটতি পড়েছিল তখন তাদের অবস্থা দাঁড়ায় খুবই সুবিধাজনক। শুধু **সামান্য** একটু চেপে বসে থাকলেই তারা চমৎকার অনেক সুবিধা জোর করে আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু তারা কী করল? শুধু **এক** বছরের জন্য নয়, না, না, **প্রতি বছরেই**, আর চিরকাল ধরে বাৎসরিক নব্বই লক্ষের মতো মুদ্রা

---

* ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ'। — সম্পাঃ

সরকারের পায়ে সঁপে দেওয়ার **অনুমতি পাওয়াটাই তারা** যথেষ্ট সুবিধা বলে গণ্য করল।

কক্ষের বেচারী 'জাতীয় উদারনীতিকদের' (৫৪) আমি তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দোষ দিতে চাই না। আমি জানি যে তাদের পিছনে যারা আছে, তারা অর্থাৎ ব্যাপক বুর্জোয়া-জনেরা বিপদের মুখে তাদের পরিত্যাগ করে গেছে। এই বুর্জোয়া-জনেরা শাসন করতে **চায়** না। ১৮৪৮ সাল এখনো রয়ে গেছে এদের মজ্জার মধ্যে।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী যে কেন এমন উল্লেখযোগ্য কাপুরুষত্ব দেখায় তা পরে আলোচনা করা হবে।

অন্যান্য দিকে অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্যটি পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। ১৮৫০ থেকে শুরু করে ছোট ছোট রাজ্যগুলি ক্রমশ আরও স্পষ্টভাবে পিছনে সরে গিয়ে এখন শুধু প্রুশীয় আর অস্ট্রীয় চক্রান্তের হাতল হিসেবে কাজ করছে; অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার মধ্যে এক কর্তৃত্বের জন্য লড়াই ক্রমশ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছে; সবার উপরে রয়েছে ১৮৬৬ সালের জবরদস্তি নিষ্পত্তি যার ফলে অস্ট্রিয়া তার নিজের প্রদেশগুলি হাতে রাখল, প্রাশিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরো উত্তরটা দখল করে নিল (৫৫), আর দক্ষিণ-পশ্চিমের তিনটি রাজ্যকে* আপাতত বাইরে ফেলে রাখা হল।

এই বিরাট রাষ্ট্রীয় খেলার সমস্তটার মধ্যে একমাত্র যে ব্যাপার জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তা হল:

প্রথমত, সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রমিকদের আইন সভায় সাক্ষাৎ প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এনে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভগবানের অনুগ্রহে লালিত অন্য তিনটি রাজমুকুট** গ্রাস করে (৫৬) প্রাশিয়া সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ভগবানের অনুগ্রহে যে রাজমুকুটের অধিকারী বলে সে আগে দাবি করত, এখনো, এই কার্যকলাপের **পরেও**, যে সেই নিষ্কলঙ্ক মুকুট তার থেকে গেল এ কথা এমন কি জাতীয় উদারনীতিকেরাও বিশ্বাস করে না।

* ব্যাভেরিয়া, বাদেন, ভুর্টেমবের্গ। — সম্পাঃ

** হানোভার, হেসেন-কাসেল, নাসাউ। — সম্পাঃ

তৃতীয়ত, এখন জার্মানিতে বিপ্লবের গুরুতর **শত্রু শুধু একটিই** রইল — প্রুশীয় সরকার।

আর চতুর্থত, শেষ পর্যন্ত এখন জার্মান অস্ট্রিয়ানদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে তারা কী হতে চায়, জার্মান না অস্ট্রিয়ান, কার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছা তাদের, জার্মানির সঙ্গে না তাদের জার্মান-বহির্ভূত লেইতা নদীর পারের লেজুড়দের সঙ্গে। বহুদিন থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এর মধ্যে তাদের একটাকে ছাড়তে হবে। কিন্তু পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ক্রমাগত প্রশ্নটা চাপা দিয়ে গেছে।

১৮৬৬ সাল সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যত বিতর্ক তখন থেকে একদিকে 'জাতীয় উদারনীতিকেরা' আর অন্যদিকে 'জনতা পার্টি' (৫৭) ন্যক্কারজনকভাবে চালিয়ে এসেছে, তার সম্বন্ধে বলা যায় যে পরবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দুইটি প্রান্ত বলেই তাদের মধ্যে বিরোধ এমন তিক্ত।

১৮৬৬ সাল জার্মানির সামাজিক অবস্থায় প্রায় কোনো পরিবর্তন আনে নি। সামান্য কয়েকটি বুর্জোয়া সংস্কার — সর্বত্র একই ওজন ও মাপের প্রচলন, গতিবিধির স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা ইত্যাদি সবই ছিল আমলাতন্ত্রের গ্রহণযোগ্য সীমারই মধ্যে। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী বহুকাল ধরে যেসব অধিকার ভোগ করে এসেছে এগুলি তার কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছয় নি, আর আসল ব্যাধি অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের প্রথাটাকে (৫৮) স্পর্শও করে নি। পুলিশের প্রচলিত কাণ্ডকারখানার ফলে আবার গতিবিধির স্বাধীনতা, আইনসিদ্ধ উপায়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার, ছাড়পত্র বিলোপ ইত্যাদি সম্পর্কে সকল বিধানই প্রলেতারিয়েতের পক্ষে মায়ায় পর্যবসিত হয়।

১৮৬৬ সালের বিরাট রাষ্ট্রীয় খেলের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ১৮৪৮ থেকে জার্মান শিল্প ও বাণিজ্যের, রেলপথের, টেলিগ্রাফের ও সমুদ্রগামী বাষ্পচালিত জাহাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি। এই একই পর্বে ইংলন্ডের বা এমন কি ফ্রান্সের তুলনায় এ প্রগতি যতই সামান্য হোক না কেন, জার্মানির ক্ষেত্রে এর তুলনা মেলে না; পূর্ববর্তী এক গোটা শতাব্দীতে যা হয়েছিল তার থেকে বেশী সাধিত হল কুড়ি বছরে। শুধুমাত্র এতদিনে

জার্মানি গুরুত্বসহকারে ও চিরকালের মতন বিশ্ববাণিজ্যে জড়িত হল। শিল্পপতিদের পুঁজি খুব দ্রুত তালে বেড়ে উঠেছে; সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক পদমর্যাদা। শিল্প সমৃদ্ধির সবচেয়ে নিশ্চিত লক্ষণ — জুয়াচুরি — অবাধ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর তার বিজয়ী রথের চাকায় বেঁধে নিয়েছে কাউণ্ট ও ডিউকদের। জার্মান পুঁজি এখন রুশ ও রুমানীয় রেলপথ গড়ছে — আহা, তার যেন ভাগ্যে বিপত্তি না আসে! অথচ মাত্র পনেরো বছর আগে পর্যন্ত জার্মান রেলপথকেই ইংরেজ শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হয়েছিল। তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণী যে রাজনৈতিক ক্ষমতাটাও দখল করে নিল না, সরকার সম্পর্কে সে যে এমন কাপুরুষোচিত ব্যবহার করে চলে তা সম্ভব হয় কী করে?

জার্মানির বুর্জোয়া শ্রেণীর দুর্ভাগ্য এই যে জার্মানদের অভ্যস্ত প্রথানুযায়ী সে বড় দেরিতে এসে পৌঁছেছে। তার যখন সমৃদ্ধির যুগ, তখন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক অধোগতি শুরু হয়ে গেছে। যে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করে তবেই ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী তার সত্যিকারের প্রতিনিধি ব্রাইটকে সরকারে ঢোকাতে পেরেছিল তার অনিবার্য ফল হবে সমগ্র বুর্জোয়া শাসনেরই অবসান। ফ্রান্সে যে বুর্জোয়া শ্রেণী সামগ্রিকভাবে শ্রেণী হিসেবে মাত্র দু বছর অর্থাৎ ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে শাসনক্ষমতা ভোগ করেছিল, — তারা লুই বোনাপার্ট ও সৈন্যবাহিনীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তবেই নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। আর সবচেয়ে উন্নত তিনটি ইউরোপীয় দেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এত বেশী বেড়ে গেছে যে যখন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসনের উপযোগিতা শেষ হয়ে গেল, তখন আজকের দিনে জার্মানিতে আর বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে স্বচ্ছন্দ রাজনৈতিক শাসনে জাঁকিয়ে বসাটা সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী সকল শাসক শ্রেণীর বিপরীতে বুর্জোয়া শ্রেণীরই বিশেষত্ব হল যে তার বিকাশের ধারা একটা বিন্দুতে পৌঁছোনের পর তার ক্ষমতার উপায়, সুতরাং মূলত তার পুঁজি, যত বাড়তে থাকে, রাজনৈতিক আধিপত্যের পক্ষে সে ততই অক্ষম হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখায়। **'বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রলেতারিয়েত।'** বুর্জোয়া শ্রেণী তার শিল্প, বাণিজ্য

ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যতই বিকাশ সাধন করতে থাকে সেই অনুপাতে সে সৃষ্টি করে যায় প্রলেতারিয়েতকে। আর বিশেষ একটা বিন্দুতে গিয়ে সে লক্ষ্য করতে শুরু করে যে তার এই প্রলেতারীয় জুড়ি তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে — অবশ্য সর্বত্র একই সময়ে বা বিকাশের একই স্তরে তা ঘটে না। সেই মুহূর্ত থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য সামর্থ্য হারাতে থাকে; সে চারিদিকে এমন মিত্র খুঁজতে থাকে যার সঙ্গে সে একজোটে শাসন ভাগাভাগি করে নেয়, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী যার হাতে নিজের শাসন পুরোটাই ছেড়ে দেয়।

জার্মানিতে ১৮৪৮ সালের মধ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণী মোড় ফেরার এই বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল। অবশ্যই, জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী জার্মান প্রলেতারিয়েতকে যত না ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে বেশী ভয় পেল ফরাসী প্রলেতারিয়েতকে দেখে। ১৮৪৮ সালে প্যারিসে জুন সংগ্রাম বুর্জোয়া শ্রেণীকে দেখিয়ে দিল তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে। সেই একই ফসলের বীজ যে ইতিমধ্যে জার্মানির মাটিতেও পোঁতা হয়ে গেছে ঠিক সে কথাটুকু প্রমাণ করার মতোই তখন যথেষ্ট অশান্ত হয়ে উঠেছিল জার্মান প্রলেতারিয়েত। তাই ঠিক সেদিন থেকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক কাজকর্মের সব ধারটুকু নষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়া শ্রেণী মিত্র খুঁজতে লাগল চারপাশে, মূল্যের দিকে নজর না রেখে নিজেকে তাদের কাছে বিকিয়ে দিল — আর আজও সে এক পা এগোতে পারে নি।

এই মিত্রদের সবারই প্রকৃতি প্রতিক্রিয়াশীল। এদের মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্র তার সৈন্যবাহিনী আর আমলাবর্গ নিয়ে; রয়েছে বৃহৎ সামন্ত অভিজাত শ্রেণী; রয়েছে ক্ষুদে নগণ্য যুঙ্কারেরা আর আছে এমন কি পুরোহিতরাও। শুধু নিজের গায়ের বহুমূল্য চামড়াটি বাঁচানোর জন্যই বুর্জোয়া শ্রেণী এদের সঙ্গে চুক্তি ও কারবার করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত বিনিময় করার মতন তার আর কিছুই হাতে থাকে নি। আর প্রলেতারিয়েত যতই বেশী বিকশিত হয়েছে, তার শ্রেণী-বোধ ও শ্রেণী-কর্ম যত শুরু হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেয়ে গেছে ততই বেশী। যখন সাদোভাতে (৫৯) প্রুশীয়দের আশ্চর্য রকম খারাপ রণকৌশল অস্ট্রীয়দের আরও বেশী আশ্চর্য রকম খারাপ রণকৌশলকে পরাজিত করল, তখন সাদোভাতে যে প্রুশীয়

বুর্জোয়াদেরও হার হয়, সেই প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, অথবা অস্ট্রীয় বুর্জোয়ারা, কে গভীরতর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল তা বলা শক্ত।

১৫২৫ সালের মাঝারি বার্গাররা যে রকম আচরণ করত আমাদের ১৮৭০ সালের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও অবিকল তাই করছে। আর পেটি বুর্জোয়া, কারিগর ও দোকানের মালিকদের সম্পর্কে বলা চলে যে তারা চিরকাল একরকমই থাকবে। তারা আশা রাখে যে ওপরে বেয়ে উঠে, জুয়াচুরি করে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে; তাদের ভয় এই যে তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পড়ে যেতে হবে। এই ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে তারা লড়াই-এর সময় নিজেদের গায়ের বহুমূল্য চামড়াটি বাঁচিয়ে চলবে, আর লড়াই শেষ হয়ে গেলে যোগ দেবে বিজয়ীদের দলে। এদের স্বভাবই হল এই।

প্রলেতারিয়েতের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকলাপ ১৮৪৮ সাল থেকে শিল্পের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। আজকের দিনে জার্মান শ্রমিকেরা তাদের ট্রেড-ইউনিয়নে, সমবায় সমিতিতে, রাজনৈতিক সঙ্ঘে ও সভায়, নির্বাচনে এবং তথাকথিত রাইখস্টাগে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, শুধু তাতেই যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় গত বিশ বছরে অলক্ষ্যে জার্মানির কী রূপান্তর ঘটেছে। জার্মানির শ্রমিকদের খুবই কৃতিত্বের কথা যে **একমাত্র তারাই** শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের এবং স্বয়ং শ্রমিকদেরও পাঠাতে পেরেছে পার্লামেন্টে, ফরাসী বা ইংরেজরা এখন পর্যন্ত সে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

কিন্তু ১৫২৫ সালের সঙ্গে যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছিল, প্রলেতারিয়েতও এখন পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সারা জীবন যে শ্রেণীকে পুরোপুরিভাবে মজুরির উপর নির্ভর করে থাকতে হয় তাদের পক্ষে জার্মান জনগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠতে এখনও অনেক দেরী। কাজেই এই শ্রেণীকেও মিত্র খুঁজতে হয়। একমাত্র পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী, শহরের লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত, ক্ষুদে চাষী এবং কৃষি-মজুরদের মধ্যেই সে মিত্রের খোঁজ মেলে।

পেটি বুর্জোয়াদের কথা আগেই বলেছি। কোনো ব্যাপারে জয়লাভের পর যখন বিয়ারখানায় তাদের হুল্লোড়ের সীমা থাকে না, সেই সময়টুকু ছাড়া

তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তবু তাদের মধ্যে খুব ভাল অনেকে আছে, যারা নিজের থেকেই শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়।

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত হল সম্ভাব্য সব মিত্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, সব শ্রেণীর অধঃপতিত অংশের গাঁজ [scum] এরা, বড় বড় শহরে সদরঘাঁটি গেড়ে থাকে। আজেবাজে এই লোকগুলি পুরাপুরি অর্থলিপ্সু এবং পুরাপুরি লজ্জাহীন। প্রত্যেক বিপ্লবের সময়েই যদি ফরাসী শ্রমিকেরা ঘরবাড়ির গায়ে লিখে রেখে থাকে: 'Mort aux voleurs!' (চোরেরা নিপাত যাক!) এবং এদের কয়েকজনকে যদি গুলিও করে থাকে, তাহলে সম্পত্তি রক্ষার উৎসাহে তারা এ কাজ করে নি, সঠিকভাবেই তারা মনে করেছে যে এই দঙ্গলটাকে দূরে রাখাই সব চাইতে দরকার। যদি কোনো শ্রমিকনেতা এই দুর্বৃত্তদের রক্ষিবাহিনী হিসেবে কাজে লাগায় বা এদের সমর্থনের উপরই নির্ভর করে, তাহলে শুধু তার থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে আন্দোলনের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

ক্ষুদে চাষীরা — বড় কৃষকেরা অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পড়ে — নানা রকমের হয়:

তারা হয়ত **সামন্ত কৃষক** হতে পারে, এবং এখনও বাধ্য হয় তাদের দয়ালু প্রভুর জন্য বেগার [corvée] খেটে যেতে। বুর্জোয়া শ্রেণী এদের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করার কর্তব্য যখন পালন করতে পারে নি, তখন এদের বোঝাতে অসুবিধা হবে না যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকেই তারা উদ্ধারলাভের আশা রাখতে পারে।

নয়ত বা তারা **খাজনাদায়ী কৃষক** [tenant farmers]। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা প্রধানত আয়র্ল্যান্ডেরই মতো। খাজনা এত বাড়িয়ে তোলা হয়েছে যে স্বাভাবিক ফসল হলেও কৃষক আর তার পরিবার কোনোক্রমে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকু করতে পারে; ফসল যখন খারাপ হয় তখন সে প্রায় উপবাসে থাকে, খাজনা দিতে পারে না, আর ফলে হয়ে পড়ে পুরাপুরিভাবে জমিদারের কৃপার মুখাপেক্ষী। একমাত্র বাধ্য হলে তবেই বুর্জোয়া শ্রেণী এই ধরনের লোকদের জন্য কিছু করে। শ্রমিক ছাড়া তবে আর কাদের কাছ থেকেই এরা উদ্ধারলাভের আশা করবে?

বাকি থাকে সেই সব কৃষক যারা নিজস্ব **ছোট ক্ষেত** চাষ করছে। বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই তারা মর্গেজে এমনই জর্জরিত যে খাজনা-দেওয়া চাষী যেমন জমিদারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এদেরও তেমনই নির্ভর করতে হয় মহাজনের উপর। এদের জন্যও অবশিষ্ট থাকে সামান্য পারিশ্রমিক মাত্র, উপরন্তু সব বছর ফসল সমান না হওয়াতে সেটার পরিমাণও খুবই অনিশ্চিত। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার আশা এদের সবচেয়ে কম, কারণ এই বুর্জোয়ারা, এই পুঁজিপতি মহাজনেরাই এদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তবু, এই কৃষকদের বেশির ভাগই প্রাণপণে তাদের সম্পত্তি আঁকড়ে থাকে, যদিও আসলে সে সম্পত্তি তাদের নয়, মহাজনদেরই। তাহলেও এদের হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যে জনগণের উপর নির্ভরশীল কোনো সরকার যখন সমস্ত মর্গেজকে রাষ্ট্রের কাছে ঋণে রূপান্তরিত করবে এবং ফলে সুদের হার কমিয়ে ফেলবে, একমাত্র তখনই এরা মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। আর সে কাজ সম্পন্ন করতে পারে শুধু শ্রমিক শ্রেণীই।

যেখানেই মাঝারি ও বড় আকারের আবাদ-মহাল রয়েছে সেখানেই গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হল **কৃষি-মজুরেরা**। উত্তর ও পূর্ব জার্মানি জুড়ে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। আর **এখানেই** শহরের শিল্প-শ্রমিকেরা তাদের **সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক মিত্রের** খোঁজ পায়। পুঁজিপতি যেমনভাবে শিল্প-শ্রমিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনভাবে কৃষি-মজুরদের মুখোমুখি রয়েছে ভূস্বামী বা বড় জোতদার। যে ব্যবস্থায় প্রথমোক্তদের উপকার হয় অন্যদেরও নিশ্চয় তাতে উপকার হবে। শিল্পরত শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের পুঁজিকে অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রাণধারণের উপকরণকে সামাজিক সম্পত্তিতে, নিজেদের দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত নিজস্ব সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেইভাবে একমাত্র তখনই কৃষি-মজুরেরা তাদের ভয়াবহ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবে যখন সর্বপ্রথমেই তাদের শ্রমের মূল উপায় অর্থাৎ জমি বৃহৎ কৃষকদের ও বৃহত্তর সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং চাষ হবে কৃষি-মজুরদের সমবায় সমিতির দ্বারা একযোগে। এখানেই আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষদের বাসেল কংগ্রেসের সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্তে এসে পড়ি: ভূমি সম্পত্তিকে সাধারণ জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করাই সমাজের স্বার্থ (৬০)। যেসব দেশে

বৃহৎ ভূমি মালিকানা আছে এবং যেখানে সেই সূত্রে এই বৃহৎ আবাদ মহালগুলি একজন প্রভু ও বহু মজুরের মাধ্যমে চালানো হয়, মূলত সেইসব দেশ সম্পর্কেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। তবুও সামগ্রিকভাবে জার্মানিতে এখনো এই ব্যবস্থারই প্রাধান্য দেখা যায়। কাজেই ইংলন্ডের পরই, **ঠিক জার্মানির পক্ষেই** এ সিদ্ধান্ত ছিল **সবচেয়ে সময়োপযোগী।** রাজাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ সংগৃহীত হয় কৃষি প্রলেতারিয়েত, কৃষি-মজুর-শ্রেণীরই মধ্য থেকে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে এই শ্রেণীই পার্লামেন্টে পাঠায় বহুসংখ্যক সামন্ত প্রভু ও য়ুঙ্কারদের, কিন্তু আবার এই শ্রেণীই হল শহরের শিল্প-শ্রমিকদের নিকটতম, এরা তাদের মতন অবস্থাতেই জীবনধারণ করে, তাদের চেয়েও গভীর দুর্দশায় ডুবে থাকে। বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত বলেই এই শ্রেণী অক্ষম, কিন্তু এদের গুপ্ত শক্তির কথা সরকার ও অভিজাতবর্গের এতটা ভালভাবে জানা আছে যে যাতে এরা অজ্ঞ হয়ে থাকে সেইজন্য তারা ইচ্ছা করেই স্কুলগুলি নষ্ট হয়ে যেতে দিচ্ছে। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে এদের আন্দোলনে টেনে আনাই হল জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে আশু জরুরী কর্তব্য। যেদিন থেকে কৃষি-মজুর জনগণ তাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝতে শিখবে সেদিন থেকে জার্মানিতে অসম্ভব হয়ে উঠবে প্রতিক্রিয়াশীল — সামন্ত, আমলাতান্ত্রিক অথবা বুর্জোয়া — সরকারের অস্তিত্ব।

১৮৭০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির আগে ফ. এঙ্গেলস লিখিত

দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসারে অনূদিত

১৮৭০ সালের অক্টোবরে লাইপজিগে প্রকাশিত ফ. এঙ্গেলসের 'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত।

১৮৭৫ সালের তৃতীয় সংস্করণের জন্য লিখিত ১৮৭০ সালের সংস্করণে সংযোজন

উপরের লাইন কয়টি লিখেছিলাম চার বছরেরও বেশী আগে। আজও কিন্তু কথাগুলি সত্য। সাদোভা ও জার্মানি বিভাগের পর যা সত্য ছিল তা আবার প্রমাণিত হচ্ছে সেদান (৬১) এবং প্রুশীয় জাতির পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্য (৬২) প্রতিষ্ঠার পর। তথাকথিত উচ্চ রাজনীতির ক্ষেত্রে 'পৃথিবী কাঁপানো' বিরাট বিরাট রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক গতি এত সামান্যই বদলে যেতে পারে।

পক্ষান্তরে বিরাট রাষ্ট্রীয় এই অনুষ্ঠানগুলি যা করতে পারে তা হল সে গতি দ্রুততর করা। এবং এ ব্যাপারে উপরোক্ত 'পৃথিবী কাঁপানো ঘটনাবলীর' নায়কেরা অনিচ্ছাকৃত সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁদের নিজেদের কাছে সে সাফল্য নিশ্চয়ই খুবই অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেগুলো গ্রহণ করতেই হয়।

১৮৬৬ সালের যুদ্ধ ইতিপূর্বেই পুরানো প্রাশিয়ার ভিতে নাড়া দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের পর পশ্চিম প্রদেশগুলির বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়, শিল্পসংশ্লিষ্ট উভয় ধরনের বিদ্রোহী ব্যক্তিদের আবার পুরাতন শৃঙ্খলার বশে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়; তবুও কাজটা সম্পন্ন হল আর সৈন্যবাহিনীর স্বার্থের পরই, পূর্ব প্রদেশগুলির যুঙ্কারদের স্বার্থটাই আবার হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রের শাসক স্বার্থ। ১৮৬৬ সালে প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিম জার্মানি হয়ে গেল প্রুশীয়। ভগবানের আশীর্বাদে অর্জিত আর তিনটি রাজমুকুট গ্রাস করার ফলে ভগবানের আশীর্বাদে অর্জিত প্রুশীয় রাজমুকুটের অপূরণীয় নৈতিক ক্ষতি হওয়া ছাড়াও রাজশক্তির ভারকেন্দ্র এখন পশ্চিমের দিকে অনেকখানি সরে যায়। প্রত্যক্ষ রাজ্যগ্রাসের ফলে চল্লিশ লক্ষ জার্মান এবং তারপর উত্তরজার্মান লীগের মাধ্যমে (৬৩) পরোক্ষভাবে যাট লক্ষ জার্মান যুক্ত হওয়ার ফলে শক্তি বৃদ্ধি হল পঞ্চাশ লক্ষ রাইনল্যান্ডার ও ওয়েস্টফালিয়ানদের। ১৮৭০ সালে আবার আরও আশি লক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মান এসে যোগ দিল (৬৪)। ফলে 'নবীন সাম্রাজ্যে' এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পুরাতন প্রাশিয়ানদের (এরা পূর্ব এলবীয় ছটি প্রদেশের লোক, তাছাড়া

আবার এদের মধ্যে কুড়ি লক্ষ পোলও আছে) মুখোমুখি দাঁড়াল প্রায় আড়াই কোটি এমন মানুষ যারা পুরানো প্রুশীয় য়ুঙ্কার সামন্ততন্ত্র বহুদিন কাটিয়ে উঠেছে। এইভাবে প্রুশীয় সৈন্যবাহিনীর জয়লাভের ফলেই সরে যায় প্রুশীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গোটা ভিত্তিটা; এমন কি সরকারের পক্ষেও এখন য়ুঙ্কারদের আধিপত্য আরও বেশী অসহনীয় হয়ে উঠল। অবশ্য ঠিক একই সঙ্গে অতি দ্রুত শিল্পোন্নতির ফলে য়ুঙ্কার ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার রেষারেষিকে ছাপিয়ে উঠল বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের সংগ্রাম। এর ফলে আভ্যন্তরীণভাবেও পুরানো রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। ১৮৪০ সাল থেকেই ধীরে পচনোন্মুখ রাজতন্ত্রের মৌলিক পূর্বশর্ত ছিল অভিজাত ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার লড়াই, যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত রাজতন্ত্র। যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিজাতবর্গকে রক্ষা করার প্রশ্নের বদলে শ্রমিক শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল সম্পত্তিবান শ্রেণীকে রক্ষা করার প্রশ্ন এসে দাঁড়াল, সেই মুহূর্ত থেকেই পুরানো একচ্ছত্র রাজতন্ত্র পুরোপুরি গ্রহণ করতে বাধ্য হল বিশেষ করে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় রূপটা, অর্থাৎ **বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রের** রূপ। বোনাপার্টতন্ত্রে প্রাশিয়ার এই রূপান্তরণের কথা আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র আলোচনা করেছি ('বাস-সংস্থান সমস্যা', দ্বিতীয় ভাগ, ২৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি)*। সেখানে যে কথার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন হয় নি, অথচ এখানে যেটা খুব দরকার তা হল এই যে, আধুনিক বিকাশের দিক থেকে প্রাশিয়া এত পিছিয়ে ছিল যে এই রূপান্তরই হল ১৮৪৮ সালের পর থেকে প্রাশিয়ার **সবচেয়ে বড় অগ্রগতি**। অবশ্য প্রাশিয়া নিশ্চয়ই তখনো আধা-সামন্ত রাষ্ট্র অথচ বোনাপার্টতন্ত্র, অন্ততঃপক্ষে রাষ্ট্রের একটা আধুনিক রূপ, যাতে ধরে নেওয়া হয় যে সামন্ত ব্যবস্থা লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং প্রাশিয়াকে তার সামন্ত ব্যবস্থার অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বিলুপ্ত করার, য়ুঙ্কারতন্ত্রই বিসর্জন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্বভাবতই কাজটা চলেছে যতটা সম্ভব নরম ধাঁচে এবং Immer langsam voran!** এই প্রিয় গানের তালে। যেমন

---

* ৮ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** সব সময়ে ধীরে এগোও! — সম্পাঃ

ধরা যাক কুখ্যাত জেলা অর্ডিন্যান্সটা। এতে নিজস্ব জমিদারিতে য়ুঙ্কারের ব্যক্তিগত সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকার লোপ করা হয়; অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল সমগ্র জেলার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বৃহৎ ভূস্বামীবর্গের হাতে। সারবস্তুটা একই রইল, শুধু অনুবাদ হল সামন্ত থেকে বুর্জোয়া উপভাষায়। পুরানো প্রুশীয় য়ুঙ্কার বাধ্য হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে ইংরেজ স্কোয়ারের* মতো এক বস্তুতে; এতখানি প্রতিরোধের তার কোনোই কারণ ছিল না, কারণ উভয়েই সমান নির্বোধ।

প্রাশিয়ার অদ্ভুত ভাগ্যলিপিটাই হল এই যে ১৮০৮ থেকে ১৮১৩ সালে শুরু হওয়া এবং ১৮৪৮ সালে আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়া তার বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাধা করতে হল শতাব্দীর শেষে বোনাপার্টতন্ত্রের প্রীতিকর রূপের ভিতর। যদি সবকিছু ভাল মতো চলে, আর পৃথিবীটা থাকে বেশ শান্তশিষ্ট, আমরাও যদি যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই — ধরা যাক ১৯০০ সালে — দেখে যেতে পারি যে প্রুশীয় সরকার সত্যিসত্যি সামন্ত বিধিব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দিয়েছে, অর্থাৎ ১৭৯২ সালেই ফ্রান্স যেখানে পৌঁছেছিল প্রাশিয়া শেষ পর্যন্ত সেই বিন্দুতে এসে পড়েছে।

ইতিবাচক রূপে প্রকাশ পেলে সামন্ততন্ত্রের বিলোপের মানে দাঁড়ায় বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। অভিজাতবর্গের বিশেষ অধিকার লোপের সঙ্গে সঙ্গে আইনব্যবস্থা ক্রমশ বেশি বুর্জোয়া হয়ে উঠতে থাকে। আর এইখানেই আমরা সরকারের সঙ্গে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্কের মূলকথাটায় এসে যাই। আমরা দেখেছি যে সরকার এই ধীরগতি সামান্য সংস্কারগুলি প্রবর্তন করতে **বাধ্য হচ্ছে।** কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে সে এইগুলিকে দেখায় বুর্জোয়াদের খাতিরে **স্বার্থত্যাগ** হিসেবে, রাজার কাছ থেকে বহুকষ্টে অর্জিত দাবি আদায় হিসেবে, যার বদলে বুর্জোয়া শ্রেণীরও উচিত সরকারের জন্য কিছুটা আত্মত্যাগ করা। আর, আসল অবস্থাটা বুর্জোয়াদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার হলেও তারা নিজেরা বোকা সাজতে রাজী হয়। যে অব্যক্ত বোঝাপড়া বার্লিনে রাইখস্টাগ ও প্রাদেশিক কক্ষের [Chamber] সব

---

* স্কোয়ার — ইংরেজ নিম্ন অভিজাতদের উপাধি। — সম্পাঃ

বিতর্কের নির্বাক ভিত্তি, তার উৎপত্তি হল এইখানে: একদিকে, সরকার বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে শামুকের গতিতে আইনের সংস্কার করে; শিল্পের পথে সামন্ততান্ত্রিক বাধা, তথা বহুসংখ্যক ক্ষুদে রাজ্যের অস্তিত্বজনিত বাধা অপসারিত করে; সকল অঞ্চলে এক মুদ্রাব্যবস্থা, এক ওজন ও এক মাপের ব্যবস্থার প্রচলন এবং পেশার স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে; যাতায়াতের স্বাধীনতা মঞ্জুর করে জার্মানির শ্রম-শক্তিকে পুঁজির অবাধ কর্তৃত্বের অধীনে এনে দেয়; আর ব্যবসা এবং জুয়াচুরির আনুকূল্য করে। অন্যদিকে, বুর্জোয়া শ্রেণী সত্যিকারের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দেয় সরকারের হাতে; কর, ঋণ ও সৈন্য সংগ্রহের পক্ষে ভোট দেয়; এবং সমস্ত নতুন সংস্কার আইন এমনভাবে রচনা করতে সাহায্য করে যাতে অবাঞ্ছিত লোকজনের উপর পুলিশের পুরানো ক্ষমতাটা থাকে অব্যাহত। নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতার আশু পরিহারের বিনিময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তার ধীরগতি সামাজিক মুক্তি ক্রয় করছে। স্বভাবতই যে প্রধান কারণে এইরকম একটা বোঝাপড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তা সরকারের সম্বন্ধে ভয় নয়, তা হল প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কেই ভয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণী যতই শোচনীয় মূর্তি ধরুক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সে তার কর্তব্য করছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়* শিল্প ও বাণিজ্যের যে উদ্দাম উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা পরবর্তী পর্বে বিপুলতর উদ্দীপনার সঙ্গে বিকাশলাভ করেছে। ১৮৬৯ সালের পর থেকে এই ব্যাপারে রাইন-ওয়েস্টফালিয়ান শিল্পাঞ্চলে যা ঘটেছে জার্মানির ক্ষেত্রে তার কোনো তুলনা মেলে না, বরং মনে পড়ে এই শতাব্দীর গোড়ায় ইংলন্ডের কারখানা অঞ্চলে যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল তার কথা। স্যাক্সনি ও উচ্চ সাইলেসিয়া, বার্লিন, হ্যানোভার ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী শহরগুলি সম্পর্কেও নিশ্চয় একই কথা প্রযোজ্য। শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্ববাণিজ্য, সত্যিকারের বৃহৎ শিল্প ও প্রকৃত আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী পাওয়া গেছে বটে। কিন্তু তার বদলে আমাদের ভাগ্যে একটা সত্যসত্যই বিপর্যয় জুটেছে এবং খাঁটি শক্তিশালী এক প্রলেতারিয়েতও দেখা দিয়েছে।

---

* এই খণ্ডের পৃঃ ১১০-১২০ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদের কাছে জার্মান প্রলেতারিয়েতের নিরহংকার ও ধীর অথচ অবিরামগতি বিকাশের তুলনায় ১৮৬৯-১৮৭৪ সালের জার্মানির ইতিহাসে স্পিখার্ন, মারস-লা-তুর (৬৫) ও সেদানের রণক্ষেত্রে হুংকার এবং তৎসংক্রান্ত সকল ব্যাপারের গুরুত্ব হবে অনেক কম। ১৮৭০ সালেই জার্মান শ্রমিক শ্রেণীকে কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল: সে পরীক্ষা হল বোনাপার্টীয় যুদ্ধ-প্ররোচনা ও তার স্বাভাবিক ফল, অর্থাৎ জার্মানিতে ব্যাপক জাতীয় উত্তেজনা। জার্মান সমাজতন্ত্রী শ্রমিকেরা নিজেদের একমুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হতে দিল না। তাদের মধ্যে উগ্রজাতিবাদের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। বিজয়ের চরম উন্মাদনার মধ্যেও তারা শান্ত থেকে দাবি করেছিল 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করা হোক; কোনো দেশ দখল চলবে না'। এমন কি সামরিক আইনও পারল না তাদের নীরব রাখতে। কোনো রণ গৌরব, 'জার্মান সাম্রাজ্যের বিভূতির' কোনো বুলি তাদের মনে রেখাপাত করতে পারে নি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থেকে গেল ইউরোপের সমগ্র প্রলেতারিয়েতের মুক্তি। নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে আর কোন দেশে শ্রমিকেরা এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নি এতটা সগৌরবে।

যুদ্ধকালীন সামরিক আইনের পর মামলা এল দেশদ্রোহিতার জন্য, রাজ মানহানির [lèse majesté] জন্য, কর্মচারীদের অপমান করার জন্য; আর সঙ্গে সঙ্গে এল ক্রমবর্ধমান শান্তিকালীন পুলিশী ঠগবাজি। 'Volksstaat' পত্রিকার (৬৬) তিন বা চারজন সম্পাদক সাধারণত একই সঙ্গে জেলে আটক থাকতেন; অন্যান্য কাগজের অবস্থা ছিল একই অনুপাতে। পার্টির প্রত্যেক খ্যাতনামা বক্তাকেই বছরে অন্তত একবার আদালতে হাজির হতে হত, আর প্রায় সবক্ষেত্রেই তারা দোষী সাব্যস্ত হত। শিলাবৃষ্টির মতন একের পর এক চলতে থাকল নির্বাসনদণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ এবং মিটিং ভাঙা, কিন্তু সবই হল বিফল। একজন গ্রেপ্তার বা নির্বাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা নিত আর একজন; একটা মিটিং ভেঙে দিলে তার জায়গায় ডাকা হত দুটো নতুন মিটিং; আর এইভাবে সহ্যশক্তি ও একাগ্র আইনানুবর্তিতার মাধ্যমেই একের পর এক এলাকায় পুলিশের স্বেচ্ছাচারী শক্তি ক্ষয়ে যেতে লাগল। এত অত্যাচারের যা উদ্দেশ্য, ফল দাঁড়াল ঠিক তার বিপরীত। শ্রমিকদের পার্টি

ভেঙে যাওয়া বা নুয়ে পড়ার বদলে, এতে করে নতুন কর্মী এসে পার্টিতে যোগ দিল, সংগঠন হল আরও মজবুত। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রমিকেরা দেখিয়ে দিল যে তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতার দিক দিয়ে উন্নততর। বিশেষ করে তথাকথিত 'কর্মদাতা'দের অর্থাৎ মালিকদের সঙ্গে বিরোধে তারা প্রমাণ করল যে, তারা মজুরেরাই এখন শিক্ষিত শ্রেণী, আর পুঁজিপতিরা হল গণ্ডমূর্খ। তারা আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এমন রসবোধ নিয়ে লড়াই চালায় যে এতে করেই সবচেয়ে ভালভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে তারা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে কতটা নিশ্চিত, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কতটা সচেতন। ইতিহাসের তৈরি মাটিতে সংগ্রাম এইভাবে চালানো হলে তার ফল মহান হতে বাধ্য। আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে জানুয়ারি নির্বাচনের সাফল্য তুলনাহীন (৬৭), এর ফলাফল সারা ইউরোপে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে তা একান্তই সঙ্গত।

ইউরোপের বাকি অংশের শ্রমিকদের তুলনায় জার্মান শ্রমিকদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আছে। প্রথমত, তারা ইউরোপের সবচেয়ে তাত্ত্বিক জাতির অংশ, আর জার্মানির তথাকথিত 'শিক্ষিত' শ্রেণীগুলি তত্ত্বের যে বোধটুকু প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে বসেছে, এরা তাকে রক্ষা করে চলছে। পূর্বগামী জার্মান দর্শন ছাড়া, বিশেষত হেগেলের দর্শন ব্যতীত বৈজ্ঞানিক জার্মান সমাজতন্ত্র — যা হল একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র — তার কখনো সৃষ্টি হত না। শ্রমিকদের মধ্যে তত্ত্বের একটা বোধ না থাকলে, এই বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র তাদের অস্থিমজ্জায় যতখানি জড়িয়ে গেছে তা কখনই সম্ভব হত না। এই সুবিধা যে কতটা অপরিসীম তা একদিকে বোঝা যায় ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর সর্ববিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ভিতর, পৃথক ইউনিয়নগুলির চমৎকার সংগঠন সত্ত্বেও তাদের আন্দোলন এত ধীরগতিতে এগোবার যেটা হল অন্যতম মূল কারণ, অন্যদিকে বোঝা যায় প্রুধোঁবাদের আদিরূপে ফরাসী ও বেলজিয়ানদের মধ্যে, এবং বাকুনিন কর্তৃক তার হাস্যকর বিকৃতি স্পেনীয় ও ইতালীয়দের মধ্যে যে ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তার ভিতর।

দ্বিতীয় সুবিধা হল এই যে তারিখ হিসেবে জার্মানেরাই প্রায় সবচেয়ে শেষে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। যেমন জার্মানদের তত্ত্বগত সমাজতন্ত্র

কোনদিন ভুলবে না যে তার প্রতিষ্ঠা হল সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে এবং ওয়েনের উপর — এঁদের কল্পনাবিলাসী নানা ধারণা ও ইউটোপীয়বাদ সত্ত্বেও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে এই তিনজনের স্থান রয়েছে, এঁদের প্রতিভা এমন বহু ব্যাপারের সন্ধান পেয়েছিল যার যাথার্থ্য আমরা এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করছি, — ঠিক তেমনই জার্মান শ্রমিকদের ব্যবহারিক আন্দোলনের কোনদিন ভোলা উচিত নয় যে ইংরেজ ও ফরাসী আন্দোলনের ভিত্তির উপরই তার বিকাশলাভ ঘটেছে, এদের বহুমূল্যে অর্জিত অভিজ্ঞতাই তারা শুধু কাজে লাগাতে পেরেছে, এবং এদের এমন অনেক ভুল এড়াতে পেরেছে যা এড়ানো সে যুগে প্রায় অসম্ভব ছিল। পূর্বগামী ইংরেজ ট্রেড-ইউনিয়নগুলির দৃষ্টান্ত এবং ফরাসী শ্রমিকদের রাজনৈতিক লড়াই ব্যতীত, প্যারিস কমিউন বিশেষ করে যে বিরাট প্রেরণা জোগাল তা ছাড়া আমাদের অবস্থা এখন কী দাঁড়াত?

জার্মান শ্রমিকদের এই কৃতিত্বটুকু স্বীকার করতেই হবে যে তারা নিজেদের পরিস্থিতির সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে এমন বোধশক্তি নিয়ে যা নিতান্ত দুর্লভ। শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে এই প্রথম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রেখে, ধারাবাহিকভাবে চালানো হচ্ছে আন্দোলনের তিনটি দিকই — তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, এবং ব্যবহারিক-অর্থনৈতিক (পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ)। বলতে গেলে ঠিক এই অনুকেন্দ্রিক আক্রমণের মধ্যেই নিহিত আছে জার্মান আন্দোলনের শক্তি ও অপরাজেয়তা।

একদিকে এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির ফলে, এবং অন্যদিকে ইংরেজ আন্দোলনের দ্বীপবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের দরুন আর ফরাসী আন্দোলন বলপূর্বক দমিত হওয়াতে এই মুহূর্তে জার্মান শ্রমিকেরা এসে দাঁড়িয়েছে প্রলেতারীয় সংগ্রামের পুরোভাগে। ঘটনাস্রোত কতদিন তাদের এই সম্মানিত পদ অধিকার করে থাকতে দেবে তা আগের থেকে বলা যায় না। কিন্তু আশা করা যাক যে যতদিন তারা এই পদে থাকবে ততদিন তারা যোগ্যতার সঙ্গে পদভার বহন করবে। তার জন্য লড়াই ও প্রচারের প্রতিক্ষেত্রে তৎপরতা দ্বিগুণ বাড়াবার প্রয়োজন। বিশেষত নেতাদের কর্তব্য হবে সকল তাত্ত্বিক প্রশ্ন সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা; পুরানো জগতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে

প্রাপ্ত চিরাচরিত বুলির প্রভাব থেকে নিজেদের ক্রমশ আরও মুক্ত করে তোলা; এবং সব সময়ে মনে রাখা যে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পর থেকে তার দাবি এই যে বিজ্ঞান হিসেবেই তাকে চর্চা করতে হবে, অর্থাৎ তাকে অধ্যয়ন করতে হবে। কর্তব্য হবে, এইরূপে আয়ত্ত স্বচ্ছতর দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বর্ধিত উদ্দীপনার সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, পার্টি ও ট্রেড-ইউনিয়ন উভয়ের সংগঠন আরও দৃঢ়সংবদ্ধ করে তোলা। জানুয়ারি মাসে সমাজতন্ত্রীদের দিকে যত লোক ভোট দিয়েছিল তারা রীতিমতো একটা বাহিনী হয়ে দাঁড়ালেও শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠতে এখনো তাদের অনেক দেরি; তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্যের সাফল্য যতই হোক না কেন, ঠিক এই ক্ষেত্রেই এখনো অজস্র কাজ বাকি পড়ে আছে। সুতরাং আমাদের নজর রাখতে হবে যে, সংগ্রামে যেন ঢিলে না পড়ে, শত্রুর হাত থেকে যেন একটা পর একটা শহর, একটার পর একটা নির্বাচনী জেলা জিতে নেওয়া যায়। প্রধান কথা হল কিন্তু খাঁটি আন্তর্জাতিক প্রেরণা বজায় রাখা, যা কোনো দেশপ্রেমিক শোভিনিজমে প্রশ্রয় দেয় না, আর, যে জাতিরই হোক না কেন, প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রতিটি অগ্রগতিকে সানন্দে স্বাগত জানায়। জার্মান শ্রমিকেরা যদি এইভাবে এগোতে থাকে তাহলে তারা আন্দোলনের ঠিক নেতৃত্বে থাকবে না — কোনো একটা বিশেষ দেশের শ্রমিকেরাই নেতৃত্বে থাকবে এটা আন্দোলনের দিক থেকে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় — বরং সংগ্রামী সারিতে তাদের থাকবে সম্মানের স্থান। আর, অপ্রত্যাশিত গুরুতর পরীক্ষা অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী যদি তাদের কাছ থেকে বর্ধিত সাহস, বর্ধিত সংকল্প ও শক্তি দাবি করে তাহলে সংগ্রামের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়াবে তারা।

লন্ডন, ১ জুলাই ১৮৭৪

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের 'Der Deutsche Bauernkrieg' গ্রন্থে প্রকাশিত, লাইপজিগ, ১৮৭৫

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজি ভাষার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

পত্রাবলী

হানোভারে ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৫

বন্ধুবর,

গতকাল আপনার পত্র পেয়েছি। চিঠিখানি আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেগেছে। আপনি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন এখন আলাদা আলাদাভাবে সেগুলির জবাব দেব।

সর্বপ্রথম **লাসালের** প্রতি আমার মনোভাব সংক্ষেপে বিবৃত করব। তিনি যখন আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়: ১) কারণ তাঁর আত্মম্ভরি হামবড়াইভাব এবং সেই সঙ্গে আমার ও আন্যান্যদের লেখা থেকে তার নির্লজ্জতম চুরি; ২) কারণ, তার **রাজনৈতিক** কৌশলকে আমি **চূড়ান্তভাবে নিন্দা করেছি**; ৩) কারণ, তাঁর আন্দোলন সুরু করার **আগেই** আমি এখানে লণ্ডনে বসে তাঁর কাছে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করেছি ও 'প্রমাণ করেছি' যে, **'প্রুশীয় রাষ্ট্রের'** দ্বারা প্রত্যক্ষ **সমাজতান্ত্রিক** হস্তক্ষেপটা বাজে কথা। আমার কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে (১৮৪৮-১৮৬৩ সাল) এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বরাবরই নিজেকে আমি যে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করি সেই পার্টিরই সমর্থক বলে ঘোষণা করে এসেছেন। লণ্ডনে যে মুহূর্তে (১৮৬২ সালের শেষাশেষি) তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আমার **সঙ্গে** চাতুরী করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই মুহূর্তে আমার এবং পুরানো পার্টির **বিরুদ্ধে** 'শ্রমিকদের একাধিপতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করলেন। এসব সত্ত্বেও আন্দোলনকারী হিসেবে তাঁর কাজের স্বীকৃতি আমি দিয়েছি, যদিও তাঁর স্বল্পকালীন কর্মজীবনের শেষ দিকে সেই আন্দোলনের প্রকৃতিও আমার কাছে ক্রমেই বেশী করে দ্ব্যর্থক বলে মনে হয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু, পুরাতন বন্ধুত্ব, কাউণ্টেস হাৎসফেল্ডের

কান্নাকাটিভরা সব চিঠি, বেঁচে থাকতে যাঁকে তারা যমের মতো ভয় করত তাঁর প্রতি বুর্জোয়া পত্রিকাগুলির **কাপুরুষোচিত ঔদ্ধত্যে** ক্রোধ, এইসব কিছুর ফলে আমি হতচ্ছাড়া ব্লিন্দের বিরুদ্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করি। (বিবৃতিটি হাৎসফেল্ড 'Nordstern' পত্রিকায় (৬৮) পাঠিয়েছিলেন।) সে বিবৃতিতে আমি লাসালের কাজকর্মের **অন্তর্বস্তু** সম্পর্কে কোনো আলোচনা করি নি। এই একই কারণে এবং আমার কাছে মারাত্মক বলে মনে হয়েছিল যেসব উপাদান তা দূর করতে পারব এই আশায় এঙ্গেলস ও আমি 'Social-Demokrat' পত্রিকায় লিখব বলে প্রতিশ্রুতি দিই (পত্রিকাখানি 'উদ্বোধনী ভাষণের'* একটি তর্জমা প্রকাশ করে, এবং পত্রিকাখানির অনুরোধে আমি প্রুধোঁর মৃত্যু উপলক্ষে প্রুধোঁ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছি**), এবং শ্‌ভাইৎসার তাঁর **সম্পাদকমণ্ডলীর একটি সন্তোষজনক কর্মসূচি** আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার পর, আমরা নিয়মিত লেখক রূপে আমাদের নাম প্রকাশের অনুমতি দিই। বেসরকারী সভ্য হিসেবে ভি. **লিব্‌ক্লেখ্‌টের** সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকাটা আমাদের পক্ষে আরও একটা গ্যারাণ্টি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আমাদের হাতে প্রমাণ এসে গেল যে, **লাসাল** আসলে পার্টির প্রতি **বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।** তিনি তখন বিসমার্কের সঙ্গে রীতিমতো একটা চুক্তি করেছেন (অবশ্য, নিজের হাতে কোনোরূপ গ্যারাণ্টি না রেখে)। কথা ছিল ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনি হামবুর্গে যাবেন এবং সেখানে (উন্মাদ শ্‌রাম ও প্রুশীয় পুলিশের গুপ্তচর মারের সঙ্গে একযোগে) বিসমার্ককে **'বাধ্য করবেন'** শ্লেজভিগ-হোলষ্টাইনকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে, অর্থাৎ শ্রমিকদের নামে ইত্যাদিতে তার অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করবেন, পরিবর্তে বিসমার্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং কিছু কিছু সোশ্যালিস্ট বুজরুকির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা, এই প্রহসনের শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে যেতে লাসাল পারলেন না! তাহলে তিনি ভয়ানক হাস্যকর ও নির্বোধ বলে প্রমাণিত হতেন, ফলে চিরকালের জন্য এ ধরনের সমস্ত চেষ্টারই অবসান ঘটত!

---

* এই খণ্ডের পৃঃ ৭-১৭ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** ঐ, পৃঃ ২৪-৩৩ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

লাসাল যে এইভাবে বিপথগামী হয়েছিলেন তার কারণ, তিনি ছিলেন হের মিকেল ধরনের **'বাস্তব রাজনীতিবিদ'** যদিও তাঁর কাঠামো ছিল অনেক প্রকান্ড, লক্ষ্যও ছিল অনেক বড়। (প্রসঙ্গত বলে রাখি, বহুদিন আগেই মিকেলকে আমি যথেষ্ট চিনে রেখেছি তাই বুঝতে পারি, তিনি যে এগিয়ে এসেছিলেন তার কারণ, এই তুচ্ছ **হানোভারীয়ান** উকিলটিকে নিজের চৌহদ্দির বাইরে সারা জার্মানিতে নিজের কণ্ঠস্বর শোনাতে পারার এবং তাতে করে হানোভারীয়ান স্বদেশে নিজের এই পরিস্ফীত **'বাস্তবতার'** প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারার ও **'প্রুশীয়'** আনুকূল্যে **হানোভারীয়ান** মিরাবো সাজার একটি চমৎকার সুযোগ দেয় ন্যাশনাল এসোসিয়েশন (৬৯)।) নিজেদের এবং ন্যাশনাল এসোসিয়েশনকে যোগদান করে 'প্রুশীয় শীর্ষটির' সঙ্গে আঁকড়ে থাকার উদ্দেশ্যে মিকেল ও তাঁর বর্তমান বন্ধুরা যেমন প্রুশীয় রাজপ্রতিনিধি প্রবর্তিত 'নূতন যুগকে' (৭০) লুফে নেন, তারা যেমন সাধারণভাবে **প্রুশীয় রক্ষণাবেক্ষণে** নিজেদের 'নাগরিক গর্ববোধ' বিকশিত করে তোলেন, ঠিক তেমনই লাসালও চেয়েছিলেন উকারমার্কের দ্বিতীয় ফিলিপের (৭১) সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মার্কুইস পোজার ভূমিকা গ্রহণ করতে, আর বিসমার্ক নেবেন তাঁর ও প্রুশীয় রাজ্যের মধ্যে আড়কাটির ভূমিকা। তিনি শুধু ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের ভদ্রলোকদের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে 'প্রুশীয় প্রতিক্রিয়াকে' আবাহন করেছিলেন আর লাসাল বিসমার্কের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে। লাসালের চেয়ে এই ভদ্রলোকদের যৌক্তিকতা ছিল বেশী, কারণ, বুর্জোয়া ঠিক তাঁদের নাকের সম্মুখের স্বার্থটাকেই **'বাস্তবতা'** বলে মনে করতে অভ্যস্ত, তাছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্রই, এমনকি সামন্ততন্ত্রের সঙ্গেও আপোস করেছে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃতিই হল এই যে, তাকে আন্তরিকভাবে 'বৈপ্লবিক' হতেই হবে।

লাসালের মতো থিয়েটারী দম্ভে ভরা চরিত্রের (চাকুরি, মেয়রের পদ ইত্যাদি তুচ্ছ ঘুষ দিয়ে, অবশ্য, তাঁকে কেনা যায় না) পক্ষে এ চিন্তা ছিল দারুণ প্রলোভনের যে, সরাসরি প্রলেতারিয়েতের হিতার্থে একটি কীর্তি সম্পন্ন করছেন ফের্ডিনান্ড লাসাল! আসলে সে কীর্তির আনুষঙ্গিক বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কে তিনি এতখানি অজ্ঞ ছিলেন যে, নিজের কাজের

সমালোচনামূলক বিচার করার শক্তি তাঁর ছিল না! ওদিকে, ঘৃণিত **'বাস্তব রাজনীতির'** ফলে ১৮৪৯-৫৯ সালের প্রতিক্রিয়াকে বরদাস্ত করতে এবং জনসাধারণের বিহ্বলতাকে চুপ করে দেখে যেতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল, আর জার্মান শ্রমিকদের **'মনোবল এতখানি ভেঙ্গে পড়েছিল'** যে, এক লাফে তাদের স্বর্গে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতিদাতা এই হাতুড়ে পরিত্রাতাকে তারা স্বাগত না জানিয়ে পারে নি।

যাই হোক, এবার পরিত্যক্ত প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। 'Social-Demokrat' প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, বৃদ্ধা হাৎসফেল্ড লাসালের 'ইচ্ছাপত্রকে' কার্যে পরিণত করতে চান। 'Kreuz-Zeitung' -এর (৭২) ভাগনার মারফৎ তিনি বিসমার্কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ (৭৩), 'Social-Demokrat' ইত্যাদি তিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ঠিক ছিল, শ্লেজভিগ-হোলষ্টাইন গ্রাস 'Social-Demokrat' পত্রিকায় ঘোষিত হবে, বিসমার্ককে সাধারণভাবে পৃষ্ঠপোষক করা হবে ইত্যাদি। লিব্‌ক্লেখট বার্লিনে ছিলেন এবং 'Social-Demokrat' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বলেই সমগ্র খাসা পরিকল্পনাটি **বানচাল** হয়ে যায়। যদিও চাটুকারী লাসাল পূজা, মাঝে মাঝে বিসমার্কের সঙ্গে ঢলাঢলি ইত্যাদির জন্য এঙ্গেলস ও আমি পত্রিকাখানির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি প্রসন্ন ছিলাম না, তথাপি বৃদ্ধা হাৎসফেল্ডের চক্রান্ত ও শ্রমিকদের পার্টির পরিপূর্ণ মর্যাদাহানি বানচাল করার জন্য আপাতত পত্রিকাখানির সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সম্পর্ক রাখা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাই, আমরা খারাপ হালের যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করেছিলাম, যদিও ব্যক্তিগতভাবে বরাবর 'Social-Demokrat' পত্রিকার কাছে আমরা লিখে আসছিলাম যে, প্রগতিপন্থীদের (৭৪) মতো বিসমার্কেরও সমানে বিরোধিতা করতে হবে। এমন কি **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির বিরুদ্ধে** বের্নহার্দ বেকার নামক সেই ফাঁকা ফুলবাবুটির চক্রান্তও আমরা সহ্য করে গিয়েছি। লাসালের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত মর্যাদাটা সে রীতিমতো গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছিল।

ইতিমধ্যে 'Social-Demokrat' পত্রিকায় হের শ্‌ভাইৎসারের প্রবন্ধগুলি ক্রমেই বেশী মাত্রায় বিসমার্কগন্ধী হয়ে দাঁড়াতে লাগল। ইতিপূর্বেই আমি

তাঁকে লিখেছিলাম যে 'জোট স্থাপনের প্রশ্নে' (৭৫) প্রগতিপন্থীদের **ভয় পাওয়ানো** যেতে পারে, কিন্তু **কোনো অবস্থাতেই, কখনো, প্রুশীয় সরকার** জোট সংক্রান্ত আইনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি মেনে নেবে না। কারণ, তাতে করে আমলাতন্ত্রে ভাঙ্গন ধরবে, শ্রমিকেরা নাগরিক অধিকার লাভ করবে, চাকরবাকর সংক্রান্ত আইন (৭৬) ভেঙ্গে চুরমার হবে, পল্লী অঞ্চলে অভিজাতগণ কর্তৃক বেত্রাঘাত করা উঠে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, যেটা বিসমার্ক কিছুতেই হতে দিতে পারেন না এবং যা প্রুশীয় **আমলাতান্ত্রিক** রাষ্ট্রের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। আমি আরো জানিয়েছিলাম যে, কক্ষ যদি জোট সংক্রান্ত আইন অগ্রাহ্য করে, তা হলে ঐ আইন বলবৎ রাখার জন্য সরকারকে **কথার প্যাঁচ** তৈরি করতে হবে (যেমন এই ধরনের কথা যে, সামাজিক প্রশ্নটির ক্ষেত্রে 'আরো আমূল' ব্যবস্থাবলী অবলম্বনের প্রয়োজন ইত্যাদি)। এ সবই সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু হের ফন শ্‌ভাইৎসার কী করলেন? তিনি এক প্রবন্ধ লিখলেন 'বিসমার্কের' **সপক্ষে** এবং তাঁর সমস্ত বীরত্ব জমিয়ে রাখলেন শুলৎসে, ফাউখার প্রমুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

আমি মনে করি শ্‌ভাইৎসার কোম্পানির **সদিচ্ছা** আছে, কিন্তু তারা **'বাস্তব রাজনীতিবিদ'**। **বর্তমান** অবস্থাটা নিয়েই তাঁদের যত হিসাব এবং 'বাস্তব রাজনীতির' **বিশেষ সুবিধাটিকে** তাঁরা শুধু মিকেল কোম্পানির হাতে দিতে রাজী নন। (শেষোক্তরা মনে হয় প্রুশীয় সরকারের সঙ্গে দহরম-মহরমের অধিকারকে তাদের বিশেষ অধিকার করে রাখতে চায়।) তারা জানে প্রাশিয়ায় (এবং তজ্জন্য বাকী জার্মানিতেও) শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা এবং শ্রমিকদের আন্দোলন কেবলমাত্র পুলিশের অনুমতিতে টিকে আছে। তাই, অবস্থাটা যা সেইভাবেই তারা তা নিতে চায়, সরকারকে বিরক্ত করা ইত্যাদি তারা চায় না, ঠিক আমাদের **'প্রজাতন্ত্রী'** বাস্তব রাজনীতিবিদদের মতোই, যারা একজন হয়েনৎসলার্ন **সম্রাটকে** মেনে নেয়। কিন্তু আমি 'বাস্তব রাজনীতিবিদ' নই, তাই এঙ্গেলসের সঙ্গে একযোগে আমি একটি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে 'Social-Demokrat' পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন মনে করেছি। (ঘোষণাটি আপনি শীঘ্রই কোনো না কোনো কাগজে দেখবেন।)

সঙ্গে সঙ্গে আপনি এটাও বুঝবেন কেন বর্তমান মুহূর্তে প্রাশিয়ায়

আমি **কিছুই** করতে পারি না। প্রুশীয় নাগরিক হিসেবে আমাকে ফেরত নিতে সেখানকার সরকার সরাসরি অস্বীকার করেছেন (৭৭)। সেখানে আমাকে শুধু সেইভাবেই **আন্দোলন করতে** দেওয়া হবে, যাতে হের বিসমার্কের আপত্তি নেই।

এখানে বসে আন্তর্জাতিক সমিতি মারফত আন্দোলন করাকে আমি শতাধিক গুণ বেশী পছন্দ করি। ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের উপর এর প্রভাব হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন এখানে সাধারণ ভোটাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছি, অবশ্য প্রাশিয়ায় এ প্রশ্নটির যে তাৎপর্য, এখানে তার **তাৎপর্য সম্পূর্ণ** (৭৮) **স্বতন্ত্র।**

এখানে, প্যারিসে, বেলজিয়মে, সুইজারল্যাণ্ডে এবং ইতালিতে মোটামুটিভাবে এই সমিতির অগ্রগতি আমাদের **সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।** একমাত্র জার্মানিতেই আমরা লাসালের ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। এ'রা: ১) নির্বোধের মতো নিজেদের প্রভাব হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত; ২) জার্মানরা যাকে বলে 'বাস্তব রাজনীতি' তার প্রতি আমার ঘোষিত বিরোধিতা সম্পর্কে অবহিত। (এই ধরনের **'বাস্তবতার'** জন্যই জার্মানি সমস্ত সভ্য দেশের এত পেছনে পড়ে আছে।)

যেহেতু এক শিলিং দিয়ে কার্ড নিলেই সমিতির সভ্য হওয়া যায়, যেহেতু ফরাসীরা (বেলজিয়ানরাও) এই ধরনের ব্যক্তিগত সভ্যপদ পছন্দ করে, কারণ 'এসোসিয়েশন' হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাদের আইনে বাধা আছে; যেহেতু জার্মানির পরিস্থিতিও এর অনুরূপ — সেইহেতু আমি এখন স্থির করেছি, জার্মানিতে আমার বন্ধুদের বলব যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই ছোট ছোট সোসাইটি গঠন করুক — সভ্য সংখ্যায় কিছু আসে যাবে না; প্রত্যেক সভ্য একখানি করে ইংলিশ সভ্য কার্ড নেবে। ইংলিশ সোসাইটি হচ্ছে **আইনী** সোসাইটি, তাই ফ্রান্সে পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে কোনো বাধা নেই। যদি আপনি ও আপনার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এইভাবে লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তবে আনন্দিত হব...

প্রথম 'Sozialistische Auslandpolitik' পত্রিকায়, নং ১৮, ১৯১৮-এ প্রকাশিত

জর্মান পাণ্ডুলিপি অনুসারে অনূদিত

হানোভারে ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ৯ই অক্টোবর*, ১৮৬৬

...জেনেভায় প্রথম কংগ্রেস (৭৯) নিয়ে আমার ভীষণ ভয় ছিল, কিন্তু মোটামুটি, আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালই হয়েছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তার প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত। আমি যেতে পারি নি এবং যেতে চাই নি, কিন্তু লণ্ডনের প্রতিনিধিদলের জন্য কর্মসূচি লিখে দিয়েছিলাম। ইচ্ছা করেই আমি কর্মসূচিটি সেই সব বিষয়েই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম যাতে শ্রমিকদের আশু মতৈক্য এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্ভব হয় এবং যা শ্রেণী-সংগ্রামের এবং একটি শ্রেণীতে শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনকে সরাসরি পুষ্ট করতে ও প্রেরণা দিতে পারে। প্রুধোঁপন্থীদের ফাঁকা বুলিতে প্যারিসের ভদ্রলোকদের মাথাগুলো ছিল ভর্তি। বিজ্ঞান নিয়ে তারা বকে খুব, কিন্তু কিছুই জানে না। সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মকে, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রামসঞ্জাত কর্মকে, সমস্ত সংহত সামাজিক আন্দোলনকে তারা ঘৃণা করে, অতএব, যাকে রাজনৈতিক উপায়ে কার্যকরী করা চলে (যেমন আইন করে শ্রম-দিবসের ঘণ্টা কমানো) তাকেও তারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। স্বাধীনতার অছিলায় এবং শাসন-বিরোধিতা বা কর্তৃত্ব বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অছিলায় এই যে ভদ্রলোকেরা ষোল বছর ধরে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার সহ্য করে এসেছেন, এখনো সহ্য করছেন, তাঁরা আসলে প্রচার করছেন সাধারণ বুর্জোয়া অর্থনীতিই, শুধু তাকে প্রুধোঁমাফিক আদর্শায়িত করে নেওয়া হয়েছে! প্রুধোঁ প্রচণ্ড ক্ষতি করেছেন। ইউটোপীয়দের সম্পর্কে তাঁর ভুয়া সমালোচনা ও ভুয়া বিরোধিতা (তিনি নিজে এক পেটি বুর্জোয়া ইউটোপীয় মাত্র, অথচ ফুরিয়ে, ওয়েন প্রমুখের ইউটোপিয়ায় নূতন জগতের একটা পূর্বাভাষ ও কাল্পনিক অভিব্যক্তি রয়েছে) প্রথমে 'ঝলমলে তরুণদের', ছাত্রদের এবং পরে শ্রমিকদের, আকৃষ্ট ও দুর্নীতিদুষ্ট করে বিশেষত প্যারিসের

---

* মূলে ভুল করে লেখা হয় — 'নভেম্বর'। — সম্পাঃ

শ্রমিকদের, যারা বিলাসিতার পণ্যোৎপাদন শিল্পের শ্রমিক হিসেবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পুরাতন আবর্জনার প্রতি দারুণভাবে মোহগ্রস্ত। অজ্ঞ, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, বাচাল, ভুয়া ঔদ্ধত্যে ফাঁপা এই লোকগুলি সবকিছু প্রায় পয়মাল করে দিতে বসেছিল, কারণ তারা যে সংখ্যায় কংগ্রেসে এসেছিল, তাদের সভ্য সংখ্যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। রিপোর্টে আমি ওদের নাম না করে একটু ঠুকব।

একই সময় বল্টিমোরে অনুষ্ঠিত আমেরিকান শ্রমিক কংগ্রেসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি (৮০)। সেখানকার স্লোগান ছিল পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংগঠন, এবং খুবই আশ্চর্য যে, জেনেভার জন্য যে দাবিগুলি আমি তৈরি করেছিলাম তার অধিকাংশই সেখানেও উপস্থাপিত হয় শ্রমিকদের নির্ভুল সহজাত প্রবৃত্তির কল্যাণে।

আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদ-সৃষ্ট সংস্কার আন্দোলন (৮১) (যাতে আমিও একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিলাম*) এখন বিরাট ও অদম্য আকার ধারণ করেছে। আমি বরাবরই নিজেকে পেছনে রেখেছি এবং এখন যখন ব্যাপারটা চালু হয়ে গেছে তখন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না...

প্রথম 'Die Neue Zeit' Bd. 2 পত্রিকায়, নং ২, ১৯০১-০২-এ প্রকাশিত

জর্মান পাণ্ডুলিপি অনুসারে অনূদিত

* ভার্জিল, 'ইনাইদ', ২য় গ্রন্থ — সম্পাঃ

টীকা

(১) ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমাবেশে গঠিত হয় শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি (পরে তা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত) এবং নির্বাচিত হয় সাময়িক কমিটি, ক. মার্কস ছিলেন তাতে। পরে তিনি সমিতির কর্মসূচিসংক্রান্ত দলিলাদি প্রণয়নের জন্য ৫ অক্টোবর সমিতির প্রথম অধিবেশনে গঠিত কমিশনে নির্বাচিত হন। মার্কসের অসুস্থতাকালে রচিত দলিল সম্পাদনার ভার কমিশন মার্কসকে দেন ২০ অক্টোবর। তৎস্থলে মার্কস লেখেন কার্যত একেবারে নতুন দুটি দলিল — 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্বোধনী ভাষণ' এবং 'সমিতির সাময়িক নিয়মাবলি'। তা অনুমোদিত হয় কমিশনের ২৭ অক্টোবরের অধিবেশনে। সমিতির পরিচালক সংস্থা হিসেবে যে সাময়িক কমিটি গড়া হয়, তা সর্বসম্মতিক্রমে 'ভাষণ' ও 'নিয়মাবলি' অনুমোদন করে ১৮৬৪ সালের ১ নভেম্বর। ইতিহাসে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ বলে পরিচিত এই সংস্থাটির নাম ১৮৬৬ সালের শেষাবধি ছিল কেন্দ্রীয় পরিষদ। কার্যত এই পরিষদে নেতৃত্ব করতেন মার্কস। তিনি ছিলেন এর সংগঠক, নেতা, বহুসংখ্যক অভিভাষণ, বিবৃতি, সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য দলিলাদির রচয়িতা।

প্রথম কর্মসূচিগত দলিল, 'উদ্বোধনী ভাষণে' মার্কস শ্রমিক সাধারণের মধ্যে এই ভাবনা সঞ্চারিত করেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার, স্বাধীন প্রলেতারীয় পার্টি গঠন এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে ভ্রাতৃকল্প সহযোগ আবশ্যক।

১৮৭৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের অবসান পর্যন্ত 'উদ্বোধনী ভাষণ' পুনর্মুদ্রিত হয় বহু বার, যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে। পৃঃ ৭

(২) **টুঁটিচেপারা** [garrotters] — যে লুঠেরারা তাদের বধ্যের টুঁটি চিপে মারত তাদের এই বলা হত। ষাটের দশকের গোড়ায় লণ্ডনে এই ধরনের হামলা হত ঘন ঘন এবং তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় পার্লামেণ্টে। পৃঃ ৮

(৩) **ব্লু বুক** ['Blue Books'] — ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রকাশনা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কূটনৈতিক দলিলাদির সাধারণ নাম। 'ব্লু বুক' নামটা এসেছে তার ব্লু

মলাটের জন্যে যা ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়ে এসেছে সতেরো শতক থেকে। এটা দেশের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাসের সরকারী তথ্য।

এক্ষেত্রে কথাটা 'নির্বাসন ও কয়েদ খাটুনি সংক্রান্ত আইনের কার্যকারিতা বিষয়ের কমিশন রিপোর্ট' নিয়ে। খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৮৬৩। পৃঃ ৮

(৪) **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১-১৮৬৫) চলে উত্তরের শিল্পপ্রধান অঙ্গরাজ্য এবং দক্ষিণের বিদ্রোহী দাসপ্রথাভিত্তিক রাজ্যগুলির মধ্যে। দাসপ্রভু আবাদ-মালিকদের পোষকতা করছিল ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা, তাদের বিরোধিতা করে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী, আমেরিকান গৃহযুদ্ধে তাদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। পৃঃ ৮

(৫) **প্রিভি কাউন্সিল** ইংলণ্ডে দেখা দেয় তেরো শতকে, প্রথমদিকে তাতে ছিল সামন্ত অভিজাত আর উঁচু মহলের যাজক সম্প্রদায়ের লোকেরা। ১৭ শতক পর্যন্ত এ পরিষদ রাজ্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পার্লামেণ্ট প্রথার বিকাশ এবং মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত পরিষদ তার গুরুত্ব হারায়। পৃঃ ৮

(৬) সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ক্যাবিনেট বলতে বোঝানো হচ্ছে রাশিয়ায় জার সরকার। ১৮ শতক থেকে রাশিয়ার রাজধানী ছিল সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ)। পৃঃ ১৩

(৭) **চার্টিস্টবাদ** — উনিশ শতকের ৩০-৪০ এর দশকে ব্রিটিশ শ্রমিকদের ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলন। ১৮৩৮ সালে চার্টিস্টরা পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করার জন্য একটি আবেদনপত্র (চার্টার, জনগণের সনদ) রচনা করে। তাতে ২১ বছর বয়স হয়েছে এমন সমস্ত পুরুষের সর্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ব্যালট, পার্লামেণ্টে প্রার্থীদের সম্পত্তিগত শর্ত নাকচ ইত্যাদির দাবি ছিল। আন্দোলন শুরু হয় বড়ো জনসভা আর শোভাযাত্রা দিয়ে, জনগনের সনদ কার্যকর করা ছিল তাদের ধ্বনি। ১৮৪২ সালের ২ মে পার্লামেণ্টে পেশ করা হয় চার্টিস্টদের দ্বিতীয় আবেদন, তাতে ছিল শ্রমদিন সংক্ষেপ, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি সামাজিক চরিত্রের একসারি দাবি। প্রথমটির মতো এই আবেদনও অগ্রাহ্য হয় পার্লামেণ্টে। চার্টিস্টরা এর জবাবে সাধারণ ধর্মঘট করে। ১৮৪৮ সালে তৃতীয় আবেদন নিয়ে পার্লামেণ্টে গণমিছিলের আয়োজন করে, কিন্তু সরকার সৈন্যবাহিনী দিয়ে মিছিল ভেঙে দেয়। আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ১৮৪৮ সালের পরে চার্টিস্ট আন্দোলনে ভাটা পড়ে।

চার্টিস্ট আন্দোলনের অসাফল্যের প্রধান কারণ তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও রণকৌশল এবং সুসঙ্গতরূপে বিপ্লবী পরিচালনা ছিল না। কিন্তু

যেমন ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে, তেমনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল চার্টিস্টরা। পৃঃ ১৩

(৮) ইংলন্ডে আইন করে শ্রমদিন দশ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করার যে আন্দোলন শুরু হয় আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের ৩০-এর দশকের গোড়ায় তা ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু নাবালক ও নারীদের জন্য প্রযোজ্য দশ ঘণ্টার শ্রমদিনের আইন পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় ১৮৪৭ সালের ৮ জুনে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহু কারখানা-মালিক তা উপেক্ষা করে। পৃঃ ১৪

(৯) 'সাধারণ নিয়মাবলি' গৃহীত হয় ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির লণ্ডন সম্মেলনে। ১ম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময় মার্কস রচিত সাময়িক নিয়মাবলি (১ নং টীকা দ্রষ্টব্য) ছিল তার ভিত্তি। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে হেগ কংগ্রেসে নিয়মাবলির ৭ ধারার পর 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে' একটি পরিপূরক ৭ক ধারা যোজনার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। পৃঃ ১৮

(১০) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষে আ. লিঙ্কনের কাছে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির অভিভাষণ মার্কস লেখেন সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ জ্বলে ওঠার মুহূর্তে এই অভিভাষণ একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল কেননা আমেরিকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যে সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা তুলে ধরা হয় এতে। সর্ববিধ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের পোষকতা করে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েত এবং আন্তর্জাতিকে তাদের অগ্রণী কর্মীদের শিখিয়েছিলেন যে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সত্যকার আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাব গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। পৃঃ ২২

(১১) ফিলাডেলফিয়ায় উত্তর আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাইয়ে গৃহীত 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র কথা বলা হচ্ছে, যাতে ব্রিটেন থেকে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিচ্ছেদ এবং স্বাধীন প্রজাতন্ত্র — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ছিল। এই দলিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা, আইনের কাছে সমস্ত নাগরিকের সমতা, জনগণের সার্বভৌমত্বের বিধান, প্রভৃতির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক নীতিও সূত্রবদ্ধ হয়। ইউরোপে যখন তদবধি সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য চলেছে, তখন এইসব নীতির ঘোষণা ইউরোপের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে, বিশেষ করে আঠারো শতকের শেষের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবকে বিশেষ প্রভাবিত

করে। কিন্তু ঘোষণায় যেসব গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা হয়েছিল, মার্কিন বুর্জোয়া আর বৃহৎ ভুস্বামীরা গোড়া থেকেই তা লঙ্ঘন করতে থাকে, রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ থেকে অপসারিত করে জনগণকে, টিকিয়ে রাখে দাসপ্রথা, যাতে প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীদের বড়ো একটা অংশ, নিগ্রোদের বঞ্চিত করা হয় প্রাথমিক মানবিক অধিকার থেকে। পৃঃ ২২

(১২) **তুলা সংকট** ঘটে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় উত্তরের নৌবহর দ্বারা দক্ষিণের দাসমালিক রাষ্ট্রগুলিকে অবরোধ করার ফলে আমেরিকা থেকে ইউরোপে তুলা চালান বন্ধ হয়ে যাবার দরুন। ইউরোপের অধিকাংশ সুতাকল অচল হয়ে পড়ে, ফলে শ্রমিকদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় দুঃসহ। এই সমস্ত ক্লেশভোগ সত্ত্বেও ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে দৃঢ় সমর্থন জানায়। পৃঃ ২৩

(১৩) ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে **ব্রিটেনের উত্তর আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা যুদ্ধ** (১৭৭৫-১৭৮৩) শুরু হয় স্বাধীনতা লাভ এবং পুঁজিবাদ বিকাশের বাধাগুলি দূর করার জন্য দানা-বেঁধে-ওঠা আমেরিকান বুর্জোয়াদের প্রয়াস থেকে। উত্তরী আমেরিকানদের বিজয়ের ফলে গঠিত হয় উত্তর আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র। পৃঃ ২৩

(১৪) **'প্রুধোঁ প্রসঙ্গে'** প্রবন্ধটি মার্কস লেখেন প্রুধোঁর মৃত্যু উপলক্ষে 'Social-Demokrat' পত্রিকার সম্পাদক শ্‌ভাইৎসারের অনুরোধে। 'দর্শনের দারিদ্র্য' এবং অন্যান্য রচনায় মার্কস প্রুধোঁর যে দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন, তার খতিয়ান টেনে তিনি এতে প্রুধোঁবাদী ভাবাদর্শের অসারতা উদ্‌ঘাটন করেন। প্রুধোঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সংকলিত করে মার্কস একে বলেছেন টিপিকাল পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শ। পৃঃ ২৪

(১৫) 'Social-Demokrat' ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') — লাসালপন্থী সারা জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের মুখপত্র। এই নামে পত্রিকাটি বার্লিন থেকে বেরয় ১৮৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত। ১৮৬৪-৬৫ সালে সম্পাদক ছিলেন ই. ব. শ্‌ভাইৎসার। পৃঃ ২৪

(১৬) প্রুধোঁর 'Essai de grammaire générale' (সাধারণ ব্যাকরণের অভিজ্ঞতা)-এর কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২৪

(১৭) জ. প. ব্রিসো দে ভারভিল-এর 'Recherches philosophiques. Sur le droit de propriété et sur le Vol, considérés dans la nature et dans la société' ('দার্শনিক গবেষণা। প্রকৃতিতে ও সমাজের বিচারে মালিকানা ও হরণের অধিকার বিষয়ে') গ্রন্থটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২৬

(১৮) Ch. Dunoyer. 'De la liberté du travail, ou Simple exposé des conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance'. T. I—III, Paris, 1845 (শ. দ্যুন্যুয়া, 'শ্রমের মুক্তি অথবা এমন পরিস্থিতির সরল বর্ণনা যাতে মানবিক শক্তি দেখা দেবে সর্বাধিক ফলপ্রদ রূপে', খণ্ড ১-৩, প্যারিস, ১৮৪৫)। পৃঃ ৩০

(১৯) ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে যাতে অর্লিয়ঁ রাজবংশ উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। পৃঃ ৩১

(২০) ১৮৪৮ সালের ৩১ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় সভায় প্রুধোঁর বক্তৃতার কথা বলা হচ্ছে। এ বক্তৃতায় প্রুধোঁ পেটি-বুর্জোয়া ইউটোপীয় মতবাদের ধারায় কয়েকটি প্রস্তাব (কর্জা সুদ নাকচ ইত্যাদি) পেশ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনে প্যারিসে প্রলেতারীয় অভ্যুত্থানের দমনকে জুলুম এবং স্বেচ্ছাচারিতা বলে অভিহিত করেন। পৃঃ ৩১

(২১) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনে প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান, অসাধারণ নিষ্ঠুরতায় তা দমন করে ফরাসী বুর্জোয়ারা। এই অভ্যুত্থান হল ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে মহান গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ৩১

(২২) ১৮৪৮ সালের ২৬ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় সভায় ফিনান্স কমিশনে প্রুধোঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিয়েরের বক্তৃতার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩১

(২৩) 'Gratuité du crédit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon.' Paris, 1850. ('খয়রাতী ঋণ, মঁসিয়ে ফ্র. বাস্তিয়া ও মঁসিয়ে প্রুধোঁর মধ্যে আলোচনা', প্যারিস, ১৮৫০)। পৃঃ ৩১

(২৪) P. J. Proudhon. 'Si les traités de 1815 ont cessé d'exister ? Actes du futur congrès'. Paris, 1863. (প. জ. প্রুধোঁ, '১৮১৫ সালের চুক্তি কি আর বলবৎ রইল না? ভবিষ্যৎ কংগ্রেসের বিধানাদি', প্যারিস, ১৮৬৩)। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্তে পোল্যান্ডকে চূড়ান্তরূপে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়, প্রুধোঁ এই রচনায় সেই সিদ্ধান্ত পুনরালোচনা করার বিরোধিতা করেন এবং পোল্যান্ডের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ইউরোপীয় গণতান্ত্রিকদের সমর্থনকেও সমালোচনা করেন, এতে করে রুশ জারতন্ত্রের উৎপীড়নমূলক পলিসিরই পোষকতা করা হয়। পৃঃ ৩২

(২৫) ১৮৬৫ সালের ২০ ও ২৭ জুন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মার্কস ইংরেজি ভাষায় যে প্রতিবেদন পড়ে শোনান, এটি তারই ভাষ্য। এতে মার্কস প্রথম

প্রকাশ্যে তাঁর বাড়তি মূল্য তত্ত্বের মূলকথাগুলি উপস্থিত করেন। প্রতিবেদনের উপলক্ষ ছিল ২ এবং ২৩ মে'তে পরিষদের সদস্য জন ওয়েস্টনের বক্তৃতা। ইনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে মুদ্রাগত পারিশ্রমিকের সাধারণ মানবৃদ্ধি শ্রমিকদের কাছে ভিত্তিহীন এবং এই থেকে তিনি ট্রেড-ইউনিয়নের 'অনিষ্টকরতার' সিদ্ধান্ত টানেন। মার্কসের প্রতিবেদন একই সঙ্গে আঘাত হানে প্রুধোঁপন্থী ও লাসালপন্থীদের ওপর, যারা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড-ইউনিয়নের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি অবলম্বন করেছিল। মার্কস এতে অতি দৃঢ়তার সঙ্গে পুঁজির শোষণের সমক্ষে প্রলেতারিয়েতের নিষ্ক্রিয়তা ও নম্রতা প্রচারের প্রতিবাদ করেন, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভূমিকা ও তাৎপর্য প্রতিপন্ন করেন তত্ত্বের দিক দিয়ে এবং এ সংগ্রামকে তার অন্তিম লক্ষ্য — মজুরি প্রথা বিলোপের লক্ষ্যে অধীনস্থ করার কথাটা তুলে ধরেন। প্রতিবেদন রক্ষিত ছিল মার্কসের পাণ্ডুলিপি আকারে। প্রথম তা প্রকাশ করেন লন্ডনে ১৮৯৮ সালে মার্কসের কন্যা এলেনোরা 'Value, price and profit' ('মূল্য দাম ও মুনাফা') নামে। তাতে ভূমিকা লিখেছিলেন ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী এ. এভেলিঙ্গ। পাণ্ডুলিপিতে অবতরণিকা এবং প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদের কোনো শিরনাম ছিল না, এগুলি দেন এভেলিঙ্গ। এই সংস্করণে সাধারণ নামটা বাদে এইসব শিরনাম রক্ষিত হয়েছে।
পৃঃ ৩৪

(২৬) 'সাময়িক নিয়মাবলিতে' ১৮৬৫ সালে ব্রুসেল্‌সে যে কংগ্রেস হবার কথা ছিল তার বদলে লন্ডনে প্রাথমিক সম্মেলন আহূত হয় (৪১ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।
পৃঃ ৩৪

(২৭) ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ সালের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে শস্য, ময়দা এবং নিত্য প্রয়োজনের আরো কিছু দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্যও দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়।
পৃঃ ৪০

(২৮) **বিজ্ঞান বিকাশে সহায়তার ব্রিটিশ সমিতি** গঠিত হয় ১৮৩১ সালে, অদ্যাবধি তা বিদ্যমান। ১৮৬১ সালের সেপ্টেম্বরে সমিতির অর্থনৈতিক বিভাগের সমাবেশে উ. নিউমার্চের (সঠিক নাম লিখতে মার্কসের কিছু ভুল হয়েছিল) ভাষণের কথা বলছেন তিনি।
পৃঃ ৪০

(২৯) দ্রষ্টব্য R. Owen. 'Observation on the Effect of the Manufacturing System'. London, 1817, p. 76. (র ওয়েন, 'শিল্প ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য', লন্ডন, ১৮১৭, পৃঃ ৭৬)।
পৃঃ ৪৪

(৩০) ১৮৫৩-১৮৫৬ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক আর সার্দিনিয়ার জোটের বিরুদ্ধে রাশিয়া এই লড়াই চালায় নিকট প্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারে আধিপত্যের জন্য। নামাঙ্কিত হয়েছে রণাঙ্গনের মূল ক্ষেত্রের নামে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসান হয় রাশিয়ার পরাজয়ে।

পৃঃ ৪৩

(৩১) উনিশ শতকের মাঝামাঝি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাড়ি ভেঙে ফেলার পেছনে একটা কারণ ছিল এই যে ভূস্বামীদের দেয় দরিদ্র কর অনেকখানি নির্ভর করত তাদের জমিতে বসবাসকারী দরিদ্রদের সংখ্যার ওপর। যেসব ঘরবাড়ি নিজেদের প্রয়োজনে লাগবে না, কিন্তু যা গ্রামাঞ্চলের 'উদ্বৃত্ত' জনতার আশ্রয় হতে পারে, সেগুলি তারা ইচ্ছে করেই ভেঙে ফেলে। পৃঃ ৪৫

(৩২) আর্ট সোসাইটি [Society of Arts] — বুর্জোয়া জ্ঞানপ্রসারণী ও লোক হিতৈষিণী সমিতি, ১৭৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনে। উল্লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন ১৮৬৪ সালে প্রয়াত জন মর্টনের পুত্র জন চালর্সর্ মর্টন। পৃঃ ৪৫

(৩৩) **শস্য আইন** বলে যা পরিচিত, বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সংকুচিত বা নিষিদ্ধ করার এ আইন ইংলন্ডে জারি হয় বৃহৎ ভূস্বামী ল্যান্ডলর্ডদের স্বার্থে। ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের কল-মালিক কবডেন ও ব্রাইটন গঠন করেন শস্য আইন বিরোধী লীগ। অবাধ বাণিজ্যের দাবি তুলে লীগ শ্রমিকদের মজুরি কমানো এবং ভূম্যধিকারী অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল করার উদ্দেশ্যে শস্য আইন নাকচ করার চেষ্টা করে। এই সংগ্রামের ফলে ১৮৪৬ সালে শস্য আইন নাকচের বিল গৃহীত হয়, যাতে সূচিত হয় ভূম্যধিকারী অভিজাতদের ওপর শিল্পপতি বুর্জোয়াদের বিজয়। পৃঃ ৪৬

(৩৪) A. Smith. 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'. Vol. I, Edinburgh, 1814, p. 93 (আ. স্মিথ, 'জাতিগুলির সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ নিয়ে জিজ্ঞাসা', খণ্ড ১, এডিনবুর্গ, ১৮১৪, পৃঃ ৯৩)। পৃঃ ৬৫

(৩৫) আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্রিটেন যে যুদ্ধবিগ্রহ চালায়, তার কথা বলা হচ্ছে। তখন ব্রিটিশ সরকার মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালু করে। বিশেষ করে এই পর্বে এক সারি জনবিক্ষোভ দমিত হয় এবং গৃহীত হয় শ্রমিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার আইনাদি। পৃঃ ৮৩

(৩৬) ম্যালথাসের 'An Inquiry into the Nature and Progress of Rent, and the Principles by which it is regulated'. London, 1815 ('খাজনার প্রকৃতি ও গতি এবং যেসব নীতিতে তা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা নিয়ে গবেষণা', লণ্ডন, ১৮১৫) নামক পুস্তিকার কথা বলছেন মার্কস। পৃঃ ৮৩

(৩৭) **শ্রম আগার** ইংলণ্ডে চালু হয় সতেরো শতকে। ১৮৩৪ সালে গৃহীত দরিদ্র আইন অনুসারে শ্রম গৃহ পরিণত হয় দরিদ্র ত্রাণের একমাত্র ধরনে। কঠোর কয়েদ-খাটুনির ব্যবস্থা ছিল তাতে, লোকে এগুলিকে বলত 'গরিবের ব্যাস্টিল দুর্গ' (হবুজখানা)। পৃঃ ৮৪

(৩৮) ষোলো শতক থেকে ইংলণ্ডে চালু **দুঃস্থ আইন** অনুসারে প্রতি প্যারিসে দরিদ্রদের উপকারার্থে বিশেষ কর আদায় করা হত। প্যারিসের যেসব অধিবাসীর নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের সংস্থান থাকত না, তারা দরিদ্র ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেত। পৃঃ ৮৯

(৩৯) D. Ricardo. 'On the Principles of Political Economy, and Taxation'. London, 1821, p. 479 (ডে. রিকার্ডো, 'অর্থশাস্ত্র এবং করধার্যের নীতি প্রসঙ্গে', লণ্ডন, ১৮২১, পৃঃ ৪৭৯)। পৃঃ ৯১

(৪০) ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বরে জেনেভায় **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক** সমিতির যে ১ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তা সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের (পরে সাধারণ পরিষদ নামে অভিহিত) প্রতিনিধিদের জন্য মার্কস **এই নির্দেশ** লেখেন। কংগ্রেসে আলোচ্য প্রশ্নাদির সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় নির্দেশনামায়। তাতে পেশ করা হয় মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্তব্য, এমন সংগ্রামের কথা, যা শ্রমিক জনগণকে ঘনবদ্ধ করবে, বাড়িয়ে তুলবে তার শ্রেণী চেতনা, শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ সংগ্রামে তাদের টেনে আনবে। মার্কস এতে যে নয়টি ধারা সূত্রবদ্ধ করেছেন, তার ছয়টি কংগ্রেসে গৃহীত হয় সিদ্ধান্ত আকারে, যথা, ক্রিয়ার আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধতা, শ্রম-দিবস হ্রাস, শিশু ও নারীর শ্রম, সমবায়ী শ্রম, ট্রেড-ইউনিয়ন, স্থায়ী ফৌজ সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব। পৃঃ ৯৫

(৪১) ১৮৬৫ সালের ২৫-২৯ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। তার কাজে অংশ নেয় সাধারণ পরিষদের সদস্যরা, এবং বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকেরা। সাধারণ পরিষদের প্রতিবেদন শ্রবণ করে সম্মেলন, তার আর্থিক দাখিলা এবং আসন্ন কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুমোদন করে। আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক রূপলাভে বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছিল এই সম্মেলন। পৃঃ ৯৫

(৪২) ১৮৬৬ সালের ২০ থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত বাল্টিমোরে যে আমেরিকান শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আইন করে আট ঘণ্টা শ্রম-দিবস জারির প্রস্তাব আলোচিত হয়। শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সমবায় সমিতি, ট্রেড-ইউনিয়নে শ্রমিকদের ঐক্যবিধান, ধর্মঘট ইত্যাদি প্রশ্নও আলোচিত হয় কংগ্রেসে। পৃঃ ৯৮

(৪৩) ১৮৬৫-১৮৬৭ সালে দ্বিতীয় ভোটাধিকার সংস্কারের জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্রিটিশ ট্রেড-ইউনিয়নগুলির ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা বলা হচ্ছে, (প্রথম সংস্কার হয়েছিল ১৮৩১-১৮৩২ সালে, তাতে পার্লামেন্টে প্রবেশের সুযোগ পায় বৃহৎ শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা)।

১৮৬৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোটাধিকার সংস্কারের পক্ষপাতীদের সভায় আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে ও ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণে সংস্কার লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয় সংস্কারের জন্য শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিচালক কেন্দ্র। মার্কসের পীড়াপীড়িতে সংস্কার লীগ দেশের সমস্ত বয়স্ক পুরুষদের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি পেশ করে। কিন্তু শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলনে আতঙ্কিত সংস্কার লীগের পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের দ্বিধা এবং ট্রেড-ইউনিয়নের সুবিধাবাদী নেতাদের আপোসপ্রবণতায় লীগ সাধারণ পরিষদের লাইন কার্যকর করতে পারে নি। ব্রিটিশ বুর্জোয়া আন্দোলনে ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়, এবং ১৮৬৭ সালে যে খণ্ডিত সংস্কার চালু হয় তাতে ভোটাধিকার পায় কেবল পেটি-বুর্জোয়া আর শ্রমিক শ্রেণীর শীর্ষমহল, শ্রমিক শ্রেণীর মূল জনসাধারণ থাকে আগের মতোই অধিকারহীন। পৃঃ ১০৩

(৪৪) আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কিন ট্রেড-ইউনিয়নগুলি উত্তরের রাষ্ট্রগুলিকে সক্রিয় সমর্থন জানায়। পৃঃ ১০৩

(৪৫) শেফিল্ডে ব্রিটিশ ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সম্মেলন হয় ১৮৬৬ সালের ১৭-২১ জুলাইয়ে। লক-আউটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন আলোচিত হয় তাতে। পৃঃ ১০৩

(৪৬) **পবিত্র-জোট** — এক-একটা দেশে বিপ্লবী আন্দোলন দমন ও সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক আমল রক্ষার জন্য ১৮১৫ সালে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ও প্রাশিয়া কর্তৃক গঠিত ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল মেল। পৃঃ ১০৫

(৪৭) জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নিকট সাধারণ পরিষদের **অভিভাষণ** লেখেন মার্কস এবং ১৮৬৯ সালের বসন্তে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধার বিপদ উপলক্ষে তা তিনি পাঠ করেন ১১ মে, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে।

জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন আমেরিকায় গঠিত হয় ১৮৬৬ সালের অগস্টে, বল্টিমোর কংগ্রেসে। গঠনের সময় থেকেই ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতিকে সমর্থনের পক্ষপাতী থাকে এবং ১৮৭০ সালে তাতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় নি। জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা অচিরেই আর্থিক সংস্কারের ইউটোপীয় প্রকল্পে মেতে ওঠেন, এর লক্ষ্য ছিল ব্যাংক ব্যবস্থা বিলোপ করে শস্তা রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রথা প্রবর্তন। ১৮৭০-১৮৭১ সালে ট্রেড-ইউনিয়নগুলি এ সংস্থা পরিত্যাগ করে এবং ১৮৭২ সালে কার্যত এটির অস্তিত্ব আর ছিল না। সমস্ত দুর্বল দিক সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন শ্রমিক সংগঠনাদির স্বাধীন রাজনীতি, নিগ্রো ও শ্বেত শ্রমিকদের একাত্মতা, ৮ ঘণ্টা শ্রম-দিবস এবং নারী শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম গড়ে তোলায় বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছিল। পৃঃ ১০৭

(৪৮) মূলে ছিল 'shoddy aristocrats'; যুদ্ধের কল্যাণে দ্রুত বড়োলোক হয়ে ওঠা লোকেদের প্রসঙ্গে এই কথাটা বলা হত। পৃঃ ১০৮

(৪৯) 'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' বইটি ফ. এঙ্গেলস লেখেন ১৮৫০ সালের গ্রীষ্মে, লণ্ডনে। এর বাস্তব তথ্যগুলি তিনি নিয়েছেন প্রধানত জার্মান গণতন্ত্রী ঐতিহাসিক ত্সিমেরমানের বই থেকে।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করেছেন ১৮৪৮ সাল থেকে জার্মানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তন, এই পর্বে বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির ভূমিকা। কৃষকদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের জোট বাঁধার যে তাত্ত্বিক বক্তব্য আছে মার্কসবাদে, এতে তা মূর্ত ও পরিবিকশিত হয়েছে। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বিভিন্ন মনোভাব অবলম্বন প্রয়োজন, বিশ্লেষণ করেছেন কৃষকদের কোন কোন স্তর এবং কী কারণে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামে সহযোগী হতে পারে।

'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ'-এর তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হবার সময় এঙ্গেলস ১৮৭০ সালের ভূমিকার পরিপূরণ করেন সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনে তত্ত্বের গুরুত্ব উল্লেখ করে। ভূমিকার সঙ্গে যোগ করা হয় শ্রমিক শ্রেণী এবং তার পার্টির সংগ্রামের চরিত্র, কর্তব্য এবং রূপের কথা। তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক-অর্থনৈতিক — এই যে তিনটি অবিচ্ছেদ্য ধারায় শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রাম চালাতে হবে, এঙ্গেলস তা নির্দিষ্ট করে দেন। পৃঃ ১১০

(৫০) 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue'. ('নতুন রাইনিশ গেজেট। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা') — মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট লীগের তাত্ত্বিক মুখপত্র। প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালের

ডিসেম্বর থেকে ১৮৫০ সালের নভেম্বর অবধি। বেরিয়েছিল পত্রিকার ছয়টি সংখ্যা। পৃঃ ১১০

(৫১) জার্মান ঐতিহাসিক ত্সিমেরমান-এর 'Allgemeine Geschichte des großen Bauernkrieges' ('মহান কৃষকযুদ্ধের ইতিহাস') বইটি তিন খণ্ডে ১৮৪১-১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় স্টুৎগার্ত থেকে। পৃঃ ১১০

(৫২) ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবকালে মাইন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্টে যে নিখিল জার্মান জাতীয় সভার অধিবেশনগুলি হয়, তাতে চরম বামপন্থী অংশের কথা বলা হচ্ছে। বামপন্থীরা ছিল প্রধানত পেটি-বুর্জোয়া স্বার্থের বাহক, কিন্তু জার্মান শ্রমিকদের একাংশও তাদের সমর্থন করত। এ সভার প্রধান কাজ ছিল জার্মানির রাজনৈতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা দূর করে একটা সর্বজার্মান সংবিধান রচনা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ উদারনৈতিক প্রতিনিধিদের দ্বিধা ও ভীরুতার ফলে সভা দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বহস্তে নিতে ভয় পায়। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে সভাকে তার অধিষ্ঠান সরিয়ে নিতে হয় স্টুৎগার্তে, আর ১৮ জুন সৈন্যবাহিনী তাকে ছত্রভঙ্গ করে। পৃঃ ১১০

(৫৩) ১৮৬৬ সালে অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর বহুজাতিক অস্ট্রীয় রাষ্ট্রের সংকট বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়ার শাসক শ্রেণীরা হাঙ্গেরির ভূস্বামীদের সঙ্গে একটা রফা করে এবং ১৮৬৭ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় দ্বৈত রাজতন্ত্র গঠনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পৃঃ ১১২

(৫৪) **জাতীয়-উদারনীতিকরা** — ১৮৬৬ সালের শরৎকালে গঠিত জার্মান বুর্জোয়াদের পার্টি। এদের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়ার আধিপত্যে জার্মান রাষ্ট্রগুলির সংযুক্তি। তাদের পলিসিতে প্রতিফলিত হয় বিসমার্কের নিকট জার্মান উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের পরাজয়বরণ। পৃঃ ১১৩

(৫৫) প্রাশিয়ার পক্ষপুটে উত্তর ও মধ্য জার্মানির ১৯টি রাষ্ট্র এবং ৩টি স্বাধীন নগর নিয়ে ১৮৬৭ সালে গঠিত উত্তরজার্মান লীগের কথা বলা হচ্ছে। প্রাশিয়ার আধিপত্যে জার্মানির ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে এই লীগ গঠন একটি নির্ধারক পর্যায়। জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ায় ১৮৭১ সালের জানুয়ারিতে লীগ তুলে দেওয়া হয়। পৃঃ ১১৩

(৫৬) ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর প্রাশিয়ার ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হানোভার রাজ্য, হেসেন-কাসেল ইলেকটোরেট এবং নাসাউ অধিরাজ্যের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১১৩

(৫৭) **জার্মান জনতা পার্টি** গঠিত হয় ১৮৬৫ সালে, এতে ছিল প্রধানত দক্ষিণ

জার্মান রাষ্ট্রগুলির পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক লোকেরা, অংশত বুর্জোয়ারা। এ পার্টি জার্মানিতে প্রাশিয়ার আধিপত্যের বিরোধিতা করে এবং তথাকথিত 'মহাজার্মানির' পরিকল্পনা পেশ করে, যাতে নাকি অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন প্রাশিয়া, তেমনি অস্ট্রিয়াও। একটি কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আকারে জার্মানির ঐক্যবিধানের বিরোধিতা করে তারা ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রচার চালায়।
পৃঃ ১১৪

(৫৮) উনিশ শতকের ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি প্রাশিয়ায় একসারি শিল্পশাখায় বিশেষ অনুমতির (কনসেশন) ব্যবস্থা চালু হয়, তা ব্যতীত শিল্পোৎপাদনে লিপ্ত হওয়া চলত না। এই অর্ধমধ্যযুগীয় শিল্প-আইনে সংকুচিত হয়েছিল পুঁজিবাদের বিকাশ।
পৃঃ ১১৪

(৫৯) সাদোভার লড়াই ঘটে চেকে ১৮৬৬ সালের ৩ জুলাই, এটাই ছিল ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের নির্ধারক সংঘর্ষ, যাতে বিজয়ী হয় প্রাশিয়া।
পৃঃ ১১৬

(৬০) ১৮৬৯ সালে ৬-১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ১ম আন্তর্জাতিকের বাসেল কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে। ১০ সেপ্টেম্বর এতে ভূমিস্বত্বের প্রশ্নে মার্কসের পক্ষপাতীদের নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

'১) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে তা সামাজিক মালিকানায় অর্পণের অধিকার আছে সমাজের।

২) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে তা সামাজিক মালিকানায় অর্পণ আবশ্যক।'

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আয়তনে ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির কয়েকটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় কংগ্রেসে।
পৃঃ ১১৯

(৬১) ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ১৮৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর সেদানের নিকট পরাজিত হয় ফরাসী সৈন্যবাহিনী এবং সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সমেত তারা বন্দী হয়। সেদান বিপর্যয়ে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ঘোষিত হয় প্রজাতন্ত্র। প্রাশিয়ার আধিপত্যে জার্মান সাম্রাজ্য গঠনে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল।
পৃঃ ১২১

(৬২) মধ্যযুগে জার্মান জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য — এই নামটাকে ঈষৎ বদলিয়ে প্রুশীয় জাতির পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যের উল্লেখ করে এঙ্গেলস এই কথাটা তুলে

ধরতে চেয়েছেন যে জার্মানির সংযুক্তি ঘটেছে প্রাশিয়ার প্রাধান্যে এবং তার সঙ্গে চলেছে জার্মান ভূমির প্রুশীয়করণ। পৃঃ ১২১

(৬৩) উত্তরজার্মান লীগ সম্পর্কে ৫৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২১

(৬৪) ১৮৭০ সালে উত্তরজার্মান লীগের সঙ্গে ব্যাভেরিয়া, বাদেন, ভুর্টেমবের্গ এবং হেসেন-ডার্মস্টাডের সংযুক্তির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১২১

(৬৫) ১৮৭০-১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সংঘর্ষগুলির কথা বলা হচ্ছে। ১৮৭০ সালের ৬ অগস্ট স্পিখার্ন (লটারিঙ্গিয়া)-র কাছে প্রুশীয় বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয় ফরাসী বাহিনী। ইতিহাসে স্পিখর্ন লড়াই ফরবাখ লড়াই বলেও উল্লিখিত হয়েছে।

১৮৭০ সালের ১৬ অগস্ট **মারস-লা-তুরে** (ভিওনভিল নামেও উল্লিখিত) লড়াইয়ে ফরাসী সৈন্যবাহিনী মেৎস ছেড়ে যেতে শুরু করে। জার্মান ফৌজ তা ঠেকাতে সমর্থ হয় এবং পরে তার পশ্চাদপসরণের পথ ছিন্ন করে দেয়।

সেদান সম্পর্কে ৬১ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২৫

(৬৬) 'Der Volksstaat' ('জনরাষ্ট্র') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৬ সাল অবধি। পত্রিকার সাধারণ পরিচালনায় ছিলেন লিবক্নেখ্ট। মার্কস ও এঙ্গেলস এ পত্রিকায় লিখতেন, বরাবর সাহায্য করেছেন তার সম্পাদনায়।

পৃঃ ১২৫

(৬৭) ১৮৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি রাইখস্টাগের নির্বাচনে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ৯ জন প্রার্থী জয়ী হয়; তাদের মধ্যে ছিলেন বেবেল ও লিবক্নেখ্ট, এ সময় তাঁরা কারাবাসে থাকেন। পৃঃ ১২৬

(৬৮) 'Nordstern' ('ধ্রুবতারা') — জার্মান সাপ্তাহিক, হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬০-১৮৬৬ সাল অবধি; ১৮৬৩ সাল থেকে লাসালপন্থী ধারার অনুগামী। পৃঃ ১৩০

(৬৯) মাইন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কংগ্রেসে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৮৫৯ সালের ১৫-১৬ সেপ্টেম্বরে। প্রাশিয়ার আধিপত্যে অস্ট্রিয়া বাদে সমস্ত জার্মানির ঐক্যসাধন ছিল এসোসিয়েশনের সংগঠকদের উদ্দেশ্য। উত্তরজার্মান লীগ গঠিত হবার পর ১৮৬৭ সালের ১১ নভেম্বর লীগ তার আত্মবিলুপ্তি ঘোষণা করে। পৃঃ ১৩১

(৭০) ১৮৫৮ সালে প্রিন্স-রিজেন্ট (শাসক প্রিন্স) মান্টেইফেল মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে নরমপন্থী উদারনীতিকদের ক্ষমতায় ডাকেন। বুর্জোয়া সংবাদপত্রে এটা

একটা গালভরা 'নূতন যুগ' বলে নন্দিত হয়। আসলে ১ম ভিলহেল্মের পলিসি ছিল শুধু প্রুশীয় রাজতন্ত্র ও য়ুঙ্কারপ্রথা (ভূস্বামী আধিপত্য) জোরদার করা। কার্যত 'নূতন যুগ' বিসমার্কের একনায়কত্বের জমি তৈরি করে, যিনি ক্ষমতায় আসেন ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বরে। পৃঃ ১৩১

(৭১) **মার্কুইস পোজা এবং দ্বিতীয় ফিলিপ** — শিলারের 'ডন কার্লোস' নাটকের দুটি চরিত্র; উকারমার্কের দ্বিতীয় ফিলিপ বলতে বোঝানো হয়েছে ১ম ভিলহেল্মকে।

উকারমার্ক — ব্রান্ডেনবুর্গ (প্রাশিয়া) প্রদেশের উত্তরাংশ, প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় য়ুঙ্কার প্রথার ঘাঁটি। পৃঃ ১৩১

(৭২) 'Kreuz Zeitung' ('ক্রুশ পত্রিকা') — **শিরোনামায় ক্রুশ প্রতীক চিহ্নিত থাকায়** জার্মান 'Neue Preußische Zeitung' ('নতুন প্রুশীয় পত্রিকা') দৈনিক পত্রের এই নাম জুটেছিল; ১৮৪৮ সালের জুনে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে; এটি ছিল প্রতিবিপ্লবী দরবারী চক্র ও য়ুঙ্কার সম্প্রদায়ের মুখপত্র।

পৃঃ ১৩২

(৭৩) **নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ** — রাজনৈতিক সংগঠন, লাসালের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালে। ১৮৭৫ সালে যখন গোথা কংগ্রেসে লাসালপন্থী ও এইজেনাখপন্থীরা (সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি) মিলিত হয় জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টিতে, ততদিন পর্যন্ত এটি বিদ্যমান ছিল।

'Social-Demokrat' — নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘের মুখপত্র।

পৃঃ ১৩২

(৭৪) **প্রগতিপন্থীরা — ১৮৬১ সালের জুনে গঠিত প্রুশীয় বুর্জোয়া পার্টির** লোকেরা। এ পার্টি প্রাশিয়ার প্রাধান্যে জার্মানির একীকরণ, সারা জার্মান পার্লামেন্ট ডাকা এবং প্রতিনিধি সভার কাছে দায়িত্ববহ উদারনৈতিক মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি করে। পৃঃ ১৩২

(৭৫) শিল্প বিধিবিধানে জোট স্থাপন ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে যেসব ধারা ছিল, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা উপলক্ষে প্রুশীয় লান্ডটাগে ১৮৬৫ সালে জানুয়ারিতে জোট স্থাপনের প্রশ্ন আলোচিত হয়। শ্রমিকদের নীতিস্বীকারের জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উৎপাদন বন্ধ নিষেধ করে যে ১৮১ ধারা ছিল তা নাকচের দাবি করে প্রগতিপন্থীরা, সেইসঙ্গে ধর্মঘটে প্ররোচনা দেবার জন্য শ্রমিকদের শাস্তি দেবার যে কথা ছিল ১৮২ ধারায়, তাও তুলে দেবার একটা বাগাড়ম্বরী দাবি জানায়। ১৮৬৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রুশীয় লান্ডটাগ শুধু ১৮১ ও ১৮২ ধারা নাকচ করে কিন্তু শ্রমিকদের দাবি পূরণ করে না।

পৃঃ ১৩৩

(৭৬) প্রাশিয়ায় প্রচলিত শিল্প বিধানকে মার্কস এই বলে শ্লেষ করেছেন। ১৮ শতকে প্রাশিয়ার প্রদেশগুলিতে 'চাকরবাকর সংক্রান্ত আইন' নামে যা চলত, তাতে প্রাধান্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক নিয়মকানুনের, যাতে ভূমিদাস কৃষকদের ওপর জমিদার ও য়ুংকারদের পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচার মঞ্জুর করা হয়। পৃঃ ১৩৩

(৭৭) ১৮৬১ সালের বসন্তে মার্কস প্রুশীয় নাগরিকত্ব পুনঃপ্রাপ্তির উদ্যোগ নেন, কিন্তু ১৮৪৫ সালে উনি 'স্বেচ্ছায়' প্রুশীয় নাগরিকত্ব বর্জন করেছেন, এই বাহ্যিক অজুহাতে তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয়। পৃঃ ১৩৪

(৭৮) ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩৪

(৭৯) ১ম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বরে। তাতে উপস্থিত থাকেন সাধারণ পরিষদ, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের বিভাগ আর শ্রমিক সমিতির ৬০ জন প্রতিনিধি। সাধারণ পরিষদের সরকারী প্রতিবেদন রূপে পঠিত হয় মার্কস রচিত 'বিভিন্ন প্রশ্নে সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের নিকট নির্দেশ' (বর্তমান খণ্ডের ৯৫-১০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী প্রুধোঁপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এর অধিকাংশ ধারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। জেনেভা কংগ্রেস শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি ও বিধিবিধানও অনুমোদন করে। পৃঃ ১৩৫

(৮০) ৪২ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৩৬

(৮১) ব্রিটেনে দ্বিতীয় ভোটাধিকার সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে (দ্রষ্টব্য ৪৩ নং টীকা)। পৃঃ ১৩৬

নামের সূচি

ভ

ম

র

ল

শ

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
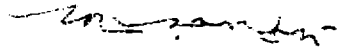
প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবভ্স্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers

17, Zubovsky Boulevard

Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

[signature]

১.৭.৮৪